বেদান্তেই এই সর্ব্বাত্ম-ভাবের বিশেষ বিকাশ, তথাপি ঋগ্বেদেই আমরা তাহার কতক আভাস পাইতেছি। আমরা দশম মণ্ডলের ১২৯ * সূক্তের অনুবাদ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। এই সূক্তের দেবতা পরমেষ্ঠী বা পরমাত্মা, ঋষি প্রজাপতি (মূলে আছে "প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী")। এই সূক্তে পাঠক দেখিবেন, সর্ব্বাত্মবাদের উন্নত সোপানে বৈদিক ঋষি কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন :—

১। তৎকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ বা যাহা নাই, তাহাও ছিল না, সৎ বা যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, বহু-বিস্তৃত আকাশও ছিল না। আবরণকারী কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম গম্ভীর মেঘ কি তখন ছিল?

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না। অহোরাত্রের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ু ব্যতিরেক আপনার মধ্যে আপনি জীবিত ছিলেন। তাহা ভিন্ন কিছুই ছিল না।

৩। সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। এই সমস্তই চিহ্ন বর্জ্জিত জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সর্ব্ব-ব্যাপী আবৃত ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মগ্রহণ করিলেন।

৪। প্রথমে মন হইতে কামের উদ্ভব। তাহা হইতেই প্রথম সৃষ্টিবীজ জন্মিল। জ্ঞানীগণ বুদ্ধিবলে হৃদয়ের আলোচনা করিয়া অসৎ হইতে সৎএর উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন।

৫। রেতোধা (জন্মদাতা পুরুষ) উৎপন্ন হইল। মহিমা সকল উৎপন্ন হইল। তাহাদের রশ্মি উভয় পার্শ্বে অধো এবং ঊর্দ্ধে বিস্তৃত হইল। স্বধা (অন্ন) নিম্নদিকে এবং প্রয়তি (জীব) ঊর্দ্ধদিকে রহিল।

৬। কেইবা তত্ত্ব জানে? কেইবা বলিবে? কোথা হইতে এসকল জন্মিল? কোথা হইতে এই বিবিধ সৃষ্টি হইল? এই বিবিধ সৃষ্টির পরে দেবতারা হইয়াছেন। যাহা হইতে এ সকল হইয়াছে, কে তাহা

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।৩। প্রজাপতে ত্বদেতান্যন্যে বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং। ১০ ।১০ম-১২১ সূ। সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভির্একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি। ৫। ১০ম—১১৪ সূ।

* নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং। ১।
মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস। ২।
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং। ৩।
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতিষ্যা কবয়ো মনীষা। ৪।
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ। ৫।
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুতইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব। ৬।
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষ পরমে ব্যোমন্ সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ। ৭। ম১০—সূ ১২৯।

জানে। (পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই বিবিধ সৃষ্টির পর দেবগণের উৎপত্তি)।

৭। এই বিবিধ সৃষ্টি যাঁহা হইতে হইল, অথবা কেহ ইহার বিধান করিয়াছেন, কি করেন নাই, যিনি ইহার অধ্যক্ষরূপে পরম ধামে আছেন, হয়ত তিনিই জানেন, কি তিনিও যদি না জানেন!

এই রূপে আমরা দেখিতে পাই, পূর্ব্ব-কথিত তিন হাজার তিনশত উনচল্লিশ সংখ্যক দেবতা পরিণামে ঋগ্বেদেই বিশ্বের এক অধ্যক্ষ স্বরূপে ("যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্") পরিণত হইয়াছে। "অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেন" 'এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির পরে দেবতারা হইয়াছেন'—অর্থাৎ দেবগণ কল্পিত মাত্র। অন্য ঋকেও বর্ণিত হইয়াছে :—"সুপর্ণ বা পক্ষী (পরমাত্মা) একই আছেন। জ্ঞানী কবিগণ তাঁহার একত্ব সত্ত্বেও বাক্য দ্বারা তাঁহাকে নানারূপে কল্পনা করিয়া থাকেন"—সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভি-রেকং সংতং বহুধা কল্পয়ন্তি॥" ১০-১১৪-৫। "একং সপ্তং বহুধা কল্পয়ন্তি॥" অথবা "তপ-সস্তন্মহিনা জায়তৈকং" 'তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্ম গ্রহণ করিলেন।' (৩) ইত্যাদি ঋগ্‌মন্ত্রে আমরা হেগেল-কথিত আত্মবহুত্ব-সাধক একত্বের (Self-differentiating unity) ও আভাস পাইতেছি।

(গ) বৃহদারণ্যকে দেবগণের বিস্তার এবং সঙ্কোচ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের সাকল্য ব্রাহ্মণে বিদগ্ধশাকল্য প্রশ্ন করিতেছেন :—"কতি দেবাঃ"—'দেবগণ কত সংখ্যক'? এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বৈশ্বদেব শাস্ত্রোক্ত বাক্যে বলিতেছেন—"ত্রয়শ্চ ত্রীণিশতা ত্রয়শ্চ ত্রীণি সহস্রাঃ—অর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার তিনশত (৩৩০০+৩৩০০=৩৬৩০০)। আবার বিদগ্ধ প্রশ্ন করিলেন :—"কতি দেবাঃ"—'দেবগণ কত সংখ্যক? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—"ত্রয় স্ত্রিংশৎ"—তেত্রিশ। এই প্রশ্ন পুনরায় করিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "যট্" 'ছয়জন'। পুনরায় প্রশ্ন করিলে পর বলিলেন "ত্রয়ঃ"—'তিন'। আবার প্রশ্ন করিলে পর বলিলেন "দুই"। শেষ প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন :—"এক"। বিদগ্ধশাকল্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন :—"সেই তেত্রিশ হাজার, তেত্রিশ শত দেবতা কে কে?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—"এ সকল দেবগণের মহিমা বা বিভূতি মাত্র। বস্তুতঃ দেবগণ "ত্রয় স্ত্রিংশৎ"—তেত্রিশ। আবার প্রশ্ন হইল "সেই ত্রয় স্ত্রিংশৎ কে কে?" তাহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আট্‌টী বসু, এগারটী রুদ্র, বারটী আদিত্য, এই একত্রিশ, এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি"। আবার প্রশ্ন : "আট্‌টী বসু কে?' উত্তর :—"অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্রমা, এবং নক্ষত্রগণ"; প্রশ্ন :—"একাদশ রুদ্র কে"। উত্তর :—"মানুষের মধ্যে দ্বাদশটী প্রাণ—অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী, এবং আত্মা অর্থাৎ মন তাহাদের একাদশ। যখনই ইহারা এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন লোককে রোদন করায়, এই জন্য ইহা-দের নাম রুদ্র"। প্রশ্ন :—"দ্বাদশ আদিত্য কে"? উত্তর :—"সম্বৎসরের দ্বাদশ মাস। ইহারা সমস্ত আদান করিয়া গমন করে, এই জন্য ইহাদের নাম আদিত্য"। প্রশ্ন :—"ইন্দ্র কে, এবং প্রজাপতি কে"? উত্তর :—"স্তনয়িত্নু বা মেঘ গর্জ্জন ইন্দ্র, যজ্ঞ প্রজাপতি। স্তনয়িত্নু কে"? "অশনি বা বিদ্যুৎ"। "যজ্ঞ কে" "পশুগণই যজ্ঞ,"—অর্থাৎ পশুবধ দ্বারাই যজ্ঞ সাধিত হয়। যজ্ঞের অন্য কোন রূপ নাই।

প্রশ্ন :—"ছয়জন দেব কে"? উত্তর :—"অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য এবং দ্যুলোক।" প্রশ্ন :—"তিন জন দেব কে"? উত্তর :—"লোকত্রয়," অর্থাৎ পৃথিবী এবং অগ্নি একত্রে এক লোক, অন্তরীক্ষ এবং বায়ু একত্রে দ্বিতীয় লোক, এবং দ্যুলোক ও আদিত্য একত্রে তৃতীয় লোক"। প্রশ্ন :—"দুইজন দেব কে"? উত্তর :—"অন্ন বা গ্রাহ্য বিষয় (objects of sense) এবং প্রাণ বা গ্রাহকাত্মা (Ego, বা Conscious self) প্রশ্ন :—"একজন দেব কে"? উত্তর :—"প্রাণ বা আত্মা (Self) বা প্রাণ স্বরূপ ব্রহ্ম,—সর্ব্বাত্মকত্ব হেতু যাহাকে মহৎ বা ব্রহ্ম বলা হয়" (শঙ্কর)। 'প্রাণ শব্দে নানা অর্থ : (১) প্রাণ শব্দে সচরাচর প্রাণাপান আদি শ্বাস বায়ু বুঝায়; বেদান্ত অনেক স্থানে প্রাণ শব্দে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্রিয়া শক্তিকে বুঝায়—যেমন প্রাণময় কোষ (Compare Nervous system) এবং (৩) প্রাণ শব্দে অনেক স্থানে আত্মা অথবা পরমাত্মাকে (Ego) বুঝায়'। উক্ত প্রকার এবং এতদ্ব্যতীত নানা অর্থে প্রাণ শব্দের ব্যবহার অনেক স্থলে বিপ্রতিপত্তির কারণ হয়। কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে পরমাত্মার প্রতি প্রাণ শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় : "এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ।। এষ লোকপাল, এষ লোকাধিপতিরেষ সর্ব্বেশ্বরঃ"। "এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা"। Conscious Self) আনন্দস্বরূপ এবং জরা মরণ রহিত। তিনি লোক সকলের পালক এবং অধিপতি, সকলের ঈশ্বর"। (কৌষীতকি ৩য় অধ্যায়) যাজ্ঞবল্ক্যও এ স্থলে প্রাণ শব্দ পরমাত্মা অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত শাকল্য ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন : "শাকল্য ব্রাহ্মণে দেবতাগণের সঙ্কোচ এবং বিস্তার বিষয়ক সংখ্যা, এবং তাহাদের স্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে প্রাণ বা ব্রহ্মরূপেই দেবগণের একত্ব। ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রভৃতি ক্রমে দেবগণ এক প্রাণেরই অন্তর্ভুক্ত। আবার সেই একই প্রাণ অনন্ত সংখ্যাতে সর্ব্বরূপে বিস্তৃত। প্রাণই এইরূপে এক এবং অনন্ত, প্রাণই তেত্রিশ প্রভৃতি অবাস্তব সংখ্যা যুক্ত" (জীবানন্দ পৃ, ৬৪৭)। এইরূপে আমরা দেখিতেছি, বৈদিক সময় হইতেই, আমাদের দেশে, একেশ্বরবাদের সহিত বাহুদেববাদের সামঞ্জস্য প্রদর্শনের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে আমাদের দেশে বহুদেববাদের সহিত একেশ্বরবাদের এমন এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ সংঘটিত হইয়াছে, যাহা পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। সামাজিক চরিত্র বিকাশের পক্ষে এই সংমিশ্রণ অনুকূলই হউক, আর প্রতিকূলই হউক, আমরা যে সংমিশ্রণের সূত্রপাত ঋগ্বেদে দেখিতে পাই, তাহাই অবতারবাদের যোগে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া অদ্যাপি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্র সকল এই সংমিশ্রণের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ।

আমরা ঋগ্বেদে যে সংমিশ্রণের সূত্রপাত দেখিতে পাই, বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে অবতারবাদ এবং মূর্ত্তিপূজার যোগে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত আকারে অদ্যাপি তাহা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রসকলও অবতারবাদ এবং মূর্ত্তিপূজার সহিত বৈদিক প্রকৃতিপূজার এবং ব্রহ্মবাদের সংমিশ্রণেরই দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রচলিত অবতারবাদ সামাজিক অথবা নৈতিক চরিত্র বিকাশের কতদূর

অনুকূল, অথবা তাহাই আমাদের জাতীয় পতনের প্রধান কারণ কি না, পাঠক চিন্তা করিবেন। তাহাই প্রদর্শন জন্য আমরা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন এবং শুকদেবের উত্তর নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ১০-৩৩-২৭ হইতে ৩১। পরীক্ষিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনা শুনিয়া যেন মর্ম্মাহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্ম প্রশমনের জন্য জগদীশ্বরের অংশভূত অগবান্ (কৃষ্ণ) অবতীর্ণ হইয়াছেন। যিনি ধর্ম্ম-সেতুর বক্তা, কর্ত্তা, এবং রক্ষিতা, তিনি কিরূপে তাহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া পরদার সেবা করিলেন?"

রাজা পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বলিতে লাগিলেন,—"ঈশ্বরদিগের মধ্যেও ধর্ম্মের ব্যতিক্রম এবং সাহস বা হট-কারিতা দৃষ্ট হয়। বহ্নির সর্ব্বভক্ষণের ন্যায় তেজস্বী পুরুষদিগের পক্ষে তাহা দূষণীয় নয়।" আমরা বলি, বরং বিপরীত, তেজস্বীর পক্ষে যাহা অত্যন্ত দূষণীয, দুর্ব্বলের পক্ষে তাহা বরং মার্জ্জনীয়। কৃষ্ণের দৃষ্টান্তের কুফল চিন্তা করিয়া যেন শুকদেবও ভীত হইয়া বলিতে লাগিলেন :—"যাহারা অনীশ্বর অর্থাৎ দুর্ব্বল-প্রকৃতি, তাহারা কদাপি মনের দ্বারাও সেরূপ আচরণ করিবেন। রুদ্রের সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণের ন্যায় মূঢ়তা বশতঃ যে ব্যক্তি সেরূপ আচরণ করে, সে বিনষ্ট হয়। ঈশ্বরদিগের বাক্যই সত্য, তাহাদের আচার কখনও কখনও সত্য। তাহাদের স্ববাক্য দ্বারা যাহা সমর্থিত, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেরূপই আচরণ করিবে।" "১০-৩৩-২৭ হইতে ৩১।" "দেবতার বেলা লীলা-খেলা, পাপ লিখেছে মানবের বেলা।" পাঠক মহাপুরুষদিগের বাক্যের (Precept) সহিত তাহাদের আচরণের (Example) বিরোধের সমর্থন করিবেন কি না, অথবা তাহা সামাজিক এবং নৈতিক চরিত্র-বিকাশের অনুকূল মনে করিবেন কি না, আমরা জানি না। কিন্তু শুকদেবের বাক্যের সহিত কৃষ্ণোক্ত গীতা-বাক্যের তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, গীতারও মত শুকদেবের বিরুদ্ধ। কৃষ্ণেরও মত এই যে, জনসমাজের পক্ষে মহাপুরুষদিগের আচরণের অনুসরণ করাই স্বাভাবিক। কৃষ্ণ বলিতেছেন :—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে, অন্যেরা তাহার অনুসরণ করে। যদি কখনও আমি মনোযোগের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে হে পার্থ, লোকেরা সকলে আমারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। গীতা ৩-২১-২৩॥ শুকদেবই স্বীকার করিতেছেন, "ঈশ্বরদিগের মধ্যে ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।" তাহা জানিয়া "ঈশ্বরকে" যাঁহারা ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন, তাঁহাদের নৈতিক পতন অবশ্যম্ভাবী। যদি সেরূপ কোন ঈশ্বর ভারতের আত্মা ("The Soul of India") হয়, তবে ভারত নিশ্চয় জগতের কৃপার পাত্র।

এ স্থলে আমরা যীশু খ্রীষ্টের উপদেশেরও উল্লেখ করিতেছি,—"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছে, "তুমি ব্যভিচার করিও না।" কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও"। (Matthew, 27. যীশুখ্রীষ্টের আদর্শ এবং জীবনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনের তুলনা করিয়া পাঠকই স্থির করুন, এই উভয়ের মধ্যে কাহার শিক্ষা সামাজিক এবং নৈতিক চরিত্র-বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে অধিকতর অনুকূল অথবা প্রতিকূল। শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

স্বদেশি-তত্ত্ব।

অগ্রহায়ণ মাসের নব্যভারত মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত চারুবাবু চৌবে মহারাজজীকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। পাঠ সাঙ্গ হইলে, চৌবেজী যুগপৎ হাস্য ও ক্রন্দন করিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু এ অধীন অনেক জিদাজিদি, পীড়াপীড়ি ও অনুনয় বিনয় করিয়া চৌবে ঠাকুরকে তাঁহার হরিষে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি, এ পক্ষের হাত এড়াইতে না পারিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অগত্যা গম্ভীর ভাবে বলিলেন. "বাপুহে, তোমাদের পৃষ্ঠদেশের সহিত আমার সাক্ষাৎ একেবারে বিফল হয় নাই। হাসিলাম, কেননা নব্যভারতের বৃদ্ধ সম্পাদক চৌধুরী মহাশয় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য 'প্রণত' শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় দোহার টানিতেছেন দেখিয়া। কান্দিলাম, কেননা কে এক সাণ্ডেলের পুত্র খেয়া হারাইয়া খাড়া হইয়াছেন। এইবার তোমরা অদ্বৈতাচার্য্যের ন্যায় আছড়াইয়া পড়। নচেৎ

"অবসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
মম শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।"

নিবেদন মিতি। মুন্সী শ্রীদিল্লগীরাম শ্রীবাস্তব্য।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিন।

বাজা শঙ্খ মহানন্দে, দেরে তোরা হুলুধ্বনি সব,
শুকতারা হাসে নভে প্রভাতের নাহি দেরি আর,
মার কোল আলো করি সদ্যোজাত ঘুমন্ত কেশব
দেয়ালায় হাসে কাঁদে, মুক্ত হেরি স্বরগের দ্বার,
দীপ জ্বলে সারা রাতি, ছায়া কাঁপে দেয়ালের গায়,
শিশু হাসে শুনি কাণে দিদিবের চির ঐক্যগান,
কেঁদে উঠে পৃথিবীর অন্ধকারে অমানিশা প্রায়,
না জানে বহিতে হবে বিশ্বের মিলন-নিশান।

এস শিশু, সদানন্দ, চিরশিশু সাগরের কূলে।
বল মোরে যুগে যুগে কোন্ শাস্ত্র হইয়াছে পাঠ;
শিশিরভূষণা ওই উষারাণী আসে ফুলে ফুলে,
সাজায়ে ললিত অঙ্গ, উজলিয়া ভক্তি-পূর্ব্বঘাট,
কমণ্ডলু আন্ তোরা, একতন্ত্রী, গৈরিক বসন,
এর বাড়া নাই কিছু এ শিশুর যোগ্য উপায়ন।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতুল বাবুর পত্রোত্তর।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নব্যভারতে 'ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয়-রচিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের সমালোচনায় আমি ব্রাহ্মসমাজ-বিষয়ক কতকগুলি ঐতিহাসিক ভ্রম প্রদর্শন করিতেছি। এখনও সে আলোচনা শেষ হয় নাই। মোট চারিটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, আরও দুটী প্রবন্ধ লিখিতে হইবে।

ইতিমধ্যে সহসা বিগত কার্ত্তিক সংখ্যক

নব্যভারতে পূর্ব্ব বঙ্গের এক মহাশয় ব্যক্তি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্. আমার লিখিত প্রথম দুটী প্রবন্ধের সমালোচনা দ্বারা এক পরোয়ানা জারি করিয়া আমার প্রতি অতি অন্যায় ভাবে আক্রমণের ও শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি একটু বিলম্ব করিলে ভাল করিতেন, সবটা শেষ হইলে, আমাকে একবারে আপাদ-মস্তক সাপ্‌টাইয়া ধরিতে ও একটা আছাড়ে সাবার করিতে পারিতেন। দুঃখের বিষয়, আমার ভাগ্যে সে আরাম সম্ভোগ ও তাঁহার ভাগ্যে সে আনন্দ লাভ বিধাতা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন; অথবা অতুলবাবু পরম ভক্ত, ভক্তের প্রাণের সহ্য শক্তির সীমা আমি এতটাই অতিক্রম করিয়াছি যে, ভক্ত হৃদয়ে আর সহ্য হইল না। তাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আসরে অবতরণ করিয়াছেন। কাজটী তিনি ভাল করিলেন কি মন্দ করিলেন, তাহা তিনি এবং তাঁহার উৎসাহদাতারা বিচার করিবেন। আমার লেখার দোষ গুণের ফলে অতুলবাবুকে যদি কিছু ক্লেশ অনুভব করিতে হয়, সে জন্য, আমি অপরিচিত ভদ্রলোক, আমাকে তিনি যেন অপরাধী না করেন, কারণ তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত সুখ দুঃখের জন্য অন্যে দায়ী হইবে না।

আলোচনার প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি যে, অতুলবাবুর প্রতিবাদ পাঠ করিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই, লেখার দোষ গুণ অল্পাধিক সকলেরই আছে ও থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি যে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সে ব্যক্তি সে বিষয়ে কোন্ সাহসে অগ্রসর হয়? তবে একটা কথা আছে "Fools rush in, where angels fear to tread." এই স্বভাবটা আবার আজ কাল অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মদেরই বেশী। অতুলবাবু একজন ব্রাহ্ম ডাক্তার। সম্ভবতঃ তিনি হাতুড়ে নহেন। কারণ তাঁহার শ্রীযুক্ত নামের পশ্চাতে লোকের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করিবার অধিকারের পরিচায়ক মেডিসিন (Medicine) ও সার্জ্জারির (Surgery) লাইসেন্স (License) স্বশরীরে বর্ত্তমান। এবং এই লাইসেন্সের বলে তিনি পল্লীর পরপারে থাকিয়াও আমার রোগ নির্ণয় করিয়া ছাড়িয়াছেন। চিন্তাজ্বর মানুষকে বড়ই বিপন্ন করে। তিনি দয়া করিয়া এতদূরে থাকিয়াও যখন আমার রোগের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন বোধ হয়, আমার জন্য তাঁহার একটু ভাবনাও হইয়াছে, তাই তাঁহার সেই দারুণ ভাবনার গুরুভার কিঞ্চিৎ লঘু করিবার জন্য জানাইতেছি, আমি বহু বৎসর হইতে অত্যন্ত কফাশ্রিত, আমার লিবারটা (Liver) দীর্ঘকাল সুস্থ কলেবরে ও বাহাল তবিয়তে বিরাজ করিতেছে। এ বিষয়ে যদি ডাক্তার বাবুর কোনও মতেই আমার মত লে-ম্যানের (Lay man) কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে আমার রোগ-পরীক্ষক ও ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা-কর্ত্তা ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস ও ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়দ্বয়কে রেফার (Refer) করিতে পারেন। তাঁহারা উভয়েই দীর্ঘকাল আমার কফের চিকিৎসা লইয়া বিব্রত; সুতরাং অতুলবাবুর চিকিৎসা শাস্ত্র মন্থনের সার তত্ত্ব আমার পিত্তাধিকার রোগ দাঁড়ায় না। ন্যাবা, কাম্‌লা ও জোয়ান্‌ডিস্ ইত্যাদি পিত্তজ রোগ আমার নাই। লিবার হিসাবে আমি একটু ভালই আছি, তাই এখনও টিঁকে আছি। বোধ হয়, তাঁহার হাতে হইলে নিশ্চয়ই এতদিন নীমতলায় বাস করিতে হইত। ভগবানের বিশেষ করুণা যে, চিকিৎসা হিসাবে, আমাকে তাঁহার হাতে

পড়িতে হয় নাই, তবে এখন যে ইতিহাস ও সাহিত্য হিসাবে তাঁহার হাতে পড়িয়াছি, তাঁহার এই "সেকুল-কাঁটা" আক্রমণের হাতে অব্যাহতি পাইতেছি না।

তাহার পর বায়ু বৃদ্ধির কথা। এ বিষয়ে আমার তাঁহাকে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিবার নাই। বিশেষতঃ তিনি ডাক্তার, আর মোটা 'লে মেন্'। তবে অতি শৈশবকাল হইতে মা, খুড়ি, জ্যাঠাই প্রভৃতির মুখে শুনিয়া আসিতেছি, বয়স্ক ধাতের লোকের মাথা ঠাণ্ডা, কারণ বুদ্ধির উগ্রতার সঙ্গেই বায়ুর প্রকোপটা কিছু বেশী, আর কফাশ্রিত লোকের বুদ্ধি কিছু মোটা হয়। কফের প্রাবল্যে বুদ্ধি বিষয়ে হীনতাই প্রতিপন্ন হয়, জানিনা, ডাক্তার বাবু বায়ুর কিরূপ গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ গবেষণার ফল যাহাই হউক, আমি কফাশ্রিত বলিয়া, বোধ হয়, বুদ্ধি বিষয়ে কিছু হীন, তাহা না হইলে, কোথাও কিছু নাই, সহসা ভ্যাডার শৃঙ্গে পড়িব কেন? অতএব নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধি কিছু মোটা, সুতরাং বায়ু বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা বড় অল্প তবে অতুল বাবুর মত লোক বোধ হয় সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। কোন না কোন উপায়ে তিনি এখনও বায়ু পিত্তের অধিকার স্থির করিবেনই। কারণ তিনি যখন ডাক্তারি করিতে করিতে অনেক পুঁড়া শুনা করিয়াছেন সেক্ষপীয়ার কপ্‌চাইতে শিখিয়াছেন, তখন সহজে পার পাইব না।

অতুল বাবু তাঁহার আলোচনার শেষে কবিবর সেক্ষপীয়ার হইতে কয়েক ছত্র তুলিয়া আমাকে একটু উপদেশও দিয়াছেন। এই ইংরাজী আওড়ানটায় আমার মনে হইতেছে যে, তিনি সেক্ষপীয়ার পড়িতে পড়িতে নানা স্থানে তাঁহার গবেষণার ফলে জানিতে পারিয়াছেন, এবং তাঁহার অনুসন্ধানের ফল পাকা পোক্ত করিবার জন্য তিনি বলিতেছেন, "কেনা জানে যে, পাশ্চাত্য কবিগণ যকৃতকেই হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার আবাস স্থল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।" বাহবা অতুল বাবু! সাবাস সিদ্ধান্ত, এ মহাসত্য তিনি সেক্ষপীয়ারেই পাইয়াছেন কি? আনাড়ীর নারী জ্ঞানের মত কবি সেক্ষপীয়ার মন্থন করিয়া কি এই মহামূল্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন? এখন দেখি, একটা নূতন সত্য শিক্ষা করিব বলিয়াই এত দিন বাঁচিয়া আছি। ডাক্তার বাবু বেশ বেশ। তবে কি জানেন, আমরা মূর্খ ও নির্ব্বোধ হইলেও, ছেলে বেলা স্কুলে গিয়েছিলাম, আমাদের মাষ্টার মহাশয়েরা (অবশ্য তাঁহার মত combined education তাদের ছিল না) আমাদিগকে কিন্তু তাঁহার "হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার" আবাস স্থল দেহের অন্যত্র (লিবার নহে) শিখাইয়াছিলেন। ডাক্তার বাবুরও ত আশে পাশে স্কুলের ছেলে আছে, একথাটা তাদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন, যদি একান্ত লজ্জার খাতিরে জিজ্ঞাসা করিতে না পারেন, তবে, প্রাচীন মাষ্টার মহাশয়ের স্বর্গারোহণ না হইলে, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি যখন বিদ্যালয়ে ও কলেজে ছাত্র ছিলেন, তখন কিন্তু এরূপ গবেষণায় বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থাই হইত। অন্ততঃ অন্য কোন সহাধ্যায়ী ঐ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দানে অতুল বাবুর কর্ণমর্দ্দনের অধিকারী হইত, একথা আমি, নির্ব্বোধ ও মূর্খ হইলেও, শপথ করিয়া বলিতে পারি। তাঁহার যকৃৎটা হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার আবাস

হইতে পারে, কিন্তু আমার ত নহে, সাধারণ জনমণ্ডলীরও নহে, কবিগণের বর্ণনায় কোথাও যকৃৎটাকে ডাক্তার বাবুর মতের পরিপোষক বলিয়া উল্লেখ নাই। এটা খাঁটি কথা, সত্যটা অন্যত্র লুকাইয়া আছে তিনি যেন অনুসন্ধান করেন। লোকে কথায় বলে "লোকটার ঘেন্না পিত্তি" নাই। লিবারটা "ঘেন্না পিত্তিরই' আবাস। আমার লিবারটা সুস্থ, সুতরাং "ঘেন্না পিত্তি' আছে, তাইএ বিষয়ে আর তাঁহাকে লজ্জা দিতে চাই না।

পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি, কফাশ্রিত বলিয়া আমার বুদ্ধি কিছু মোটা, তত সূক্ষ্ম নহে, সূক্ষ্ম হইলে এবং ধারাল হইলে, "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত" হইয়া, আবার "শাস্ত্রী মহাশয়ের পুরাতন শিষ্য বলিয়া পরিচয়" দিয়া, আমি কেমন করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত ইতিহাসের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি? "সেয়ানা" হইলে কি কখন এত বড় "নিষ্ঠুর ও কদর্য্য আচরণ করিতে" আমার সাহসে কুলায়? সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, আমার "এই ব্যাধি বায়ুপিত্তের দ্বন্দ্ব" না হইয়া বুদ্ধিহীনের বাচালতা। অতুল বাবুর মত বুদ্ধিমান লোক, অবশ্যই যখন যে দলে থাকেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই দলের খাতিরে ও উপদেষ্টা গুরুর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নীরবে সত্যাসত্য, ন্যায়ান্যায় হজম করিতে বেশ পটু, আমার নিশ্চয়ই সে শক্তি নাই, আমি সরলভাবে আমার এ দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতেছি; আর এই জন্যই দ'লো হইতে পারিলাম না। এ বিষয়ে আমার ধর্ম্ম বুদ্ধি, অতুল বাবুর মত "স্থিতিস্থাপক গুণ বিশিষ্ট" নহে।

অতুল বাবু সাহিত্যের বাজারের কোন সংবাদ না রাখিয়াও সাহিত্যিক সাজিতে জানেন, ব্রাহ্ম-সমাজের বিষয়ে, বিশেষ ভাবে প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়েও সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও তিনি ঐতিহাসিক, এরূপ বেয়াদবী কেবল তাঁহার মত ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেই শোভা পায়। তাই তাঁহারও শোভা পাইয়াছে। তিনি ডাক্তার মানুষ, তাঁহার নাড়ীজ্ঞান বৃদ্ধি করাই ভাল, সাহিত্য ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে, তিনি চালে খড় তুলে দিবার যোগ্য লোক হইয়া ঘরামিগিরি করিতে যান কেন? এই টাই কি "গাত্র কণ্ডূয়ন নহে"? এরূপ ভাবে নিজের সুস্থ শরীরে ঘা করিবার কি প্রয়োজন?

আমার দুঃখ এই যে, অতুল বাবুর আসল কথাটার উত্তর দিতে আমাকে বাধ্য হইয়া ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয়ের বিষয়ে এমন একটু আলোচনা করিতে হইতেছে, যাহা আমি আদৌ ইচ্ছুক নহি। কারণ সে গুলি পুরাতন কথা এবং আলোচনার অযোগ্য। আমি যতটা পারিয়াছি, পূর্ব্বে সাবধান ছিলাম, এখনও চেষ্টা করিব। আমার চক্ষে অতুল বাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের, পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র বেশে "মহীরাবণ", তিনি শিষ্য বেশে শাস্ত্রী মহাশয়ের শত্রু। তিনি এমন কয়টা কথার অবতারণা করিয়াছেন, যে গুলির উত্তর দান আমার পক্ষে ক্লেশকর, তথাপি সত্যের খাতিরে উল্লেখ করিতে হইতেছে। ইতিহাসের আলোচনায় আমি কোন প্রকার "ব্যক্তিগত" বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। কেবল ঐতিহাসিক আলোচনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলাম। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই নম্বর ওয়ান (one) উকিলটী আমাকে "ব্যক্তিগত" আলোচনায় বাধ্য করিতেছেন, এ বিষয়ে আমি বহু বহু প্রমাণ দিতে সক্ষম হইলেও, কেবল একটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব,

আর শাস্ত্রী মহাশয় যেন সে জন্য আমাকে ক্ষমা করেন। আর অতুল বাবু যেন এতেই সন্তুষ্ট হন, তা না হ'লে আমাকে বহুবিধ অপ্রীতিকর আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, আমি তাহাতে কিছুতেই সম্মত নহি। আমি কেবল বিষয়-বিশেষের গুরুত্ব এবং সেই গুরুতর বিষয় শাস্ত্রী মহাশয়ের শিক্ষা দীক্ষা ও পদ-মর্য্যাদার সম্পূর্ণ অনুপযোগী ভাবে ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রতিবাদ-পরায়ণ হইয়াছি, নতুবা সমাজ সম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমি এখন যেমন নীরব, এ বিষয়েও ঠিক সেইরূপ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতাম। অতুল বাবু মানুষের হৃদয় মনের উচ্চ ভাবের সম্মান রক্ষায় এতটা উদাসীন যে, তাঁহাকে হয় ত বুঝাইতেই পারিব না, আমি কতটা ক্লেশ অনুভব করিয়া ঐ ইতিহাসোক্ত বিবিধ অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমার ভিতর "অসৎ সাহস"ও"ধৃষ্টতা" নাই। তবে অতুল বাবু অনুগ্রহ করিয়া বলিতেছেন, "অর্থাৎ গুরুমারা বিদ্যাই যদি সৎসাহসের কার্য্য হয়, তবে অসৎ সাহস ও ধৃষ্টতা কাহাকে বলে"। আমি ত আমার সাহসকে সৎ কি অসৎ, কিছুই বলি নাই। আমার পাঠকগণের ভাল মন্দ বিচার করিবার স্বাধীনতাও অস্বীকার করি নাই, অতুল বাবু আমার কাজকে "ধৃষ্টতা" বলিয়াছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দৌড় আমার মাপকাঠির আয়ত্তাধীন নহে, তবে আমার আলোচনা যদি কুশিক্ষার পরিচায়ক হয়, এটা যদি মন্দ কাজ হয়, এটা যদি অসৎ সাহস হয়, তবে আমার এরূপ আচরণের জন্য এই "গুরুমারা বিদ্যার" জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ই দায়ী। শাস্ত্রী মহাশয় নানা আকারে কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে যতই উত্তম কথা বলুনা না কেন, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আচার্য্য কেশবের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি ভাবাপন্ন নহেন, এটা নানা ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে, আর ব্রাহ্মসমাজের মর্য্যাদার খাতিরে সে আলোচনায় আমি সম্পূর্ণ সক্ষম। এটাও ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক ঘটনা, এটা অতুলবাবুর জানা থাকা উচিত ছিল। তাঁহার অজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করিলেই ভাল হইত, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে আমাকে এতটাই আক্রমণ করিয়াছেন যে, তাহার প্রতিকারপরায়ণ না হইলে, নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় কাজ হয়। যদিও আমি জানি, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান-বিশিষ্ট লোক অন্যের মর্য্যাদাও সমানভাবে আদরের বস্তু মনে করে, অনেক ব্রাহ্মের এ শিক্ষা না থাকিলেও, প্রত্যেক ভদ্র সন্তানের তাহা আছে। তাই ব্যক্তিগত ভাবে শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে নিতান্তই ব্যথিত হইতেছি। আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছি যে, আমার মত অনেকের প্রাথমিক ব্রাহ্মীক শিক্ষার জন্য তিনিই দায়ী। সে সকল অর্থপূর্ণ কথাগুলি অতুল বাবুর দিব্য দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার দীক্ষাগুরু ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য কেশবের বৈরাগ্য সাধন লইয়া 'নকড়া ছকড়া" করিয়াছেন। "সন্ন্যাসী ঠাকুরের অপরূপ লীলা"র মুক্তামালা রচনা করিয়া আচার্য্যকে উপহার দিয়াছেন। তখন সাধারণ-সমাজ হয় নাই। আজ এই দীর্ঘকাল পরে সেই কবিতার সমগ্র অংশ উদ্ধৃত করিয়া কেশবচন্দ্রের প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের মর্ম্মান্তিক অবজ্ঞা—বহুকাল হইতে পোষিত বিরুদ্ধভাব, সে কদর্য্য সমালোচনা, পূর্ণাবয়বে মুদ্রিত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে অতুল বাবু চির-অন্ধকারে থাকিলেও ক্ষতি নাই। সে আলোকে তাঁহার দিব্য-

দৃষ্টি বিনষ্ট হইতে পাবে। শাস্ত্রী মহাশয়কে সে মহাকাব্যের জন্য কখন ক্ষোভ প্রকাশ করিতে শুনি নাই, আর দীর্ঘকালব্যাপী নানা ঘটনায়, কেশব সম্বন্ধে তাঁহার ঐ বদ্ধমূল সংস্কারেরই পরিচয় পাইয়াছি। সুতরাং ঐরূপ মত-পোষণকারীর পক্ষে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে যাওয়া কোন মতেই ধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি না। অতুল বাবুর মত লোকের দৃষ্টিতে ধর্ম্মবর্ম্মাবৃত পুরুষের এরূপ আচরণে উকিল থাকিতে পারে, কিন্তু ইতিহাসানুরাগী কোন সত্যপ্রিয় ও মুক্ত-হৃদয় ব্যক্তি ইহার পক্ষ সমর্থন করিবেন না। অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক কেশব পরীক্ষাগারে কতটুকু অপরাধের জন্য বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্রী মহাশয় বেশ জানেন, অন্ততঃ তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার এবিষয়ক জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, তত্রাপি তাঁহার প্রবল লোভ সংযত হয় নাই। এই ঘটনার সময় কেশব ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে আসেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের একটা সামান্য ঘটনাকে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এরূপ ভাবে বৃহদায়তন করিয়া তুলিবার কি প্রয়োজন ছিল, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে এখন তাহা প্রবেশ করিতেছে না। আর তাহাই যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে রাজর্ষি রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাথমিক জীবনের এরূপ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় এমন নীরব কেন? তাঁহারা কেহই একবারে মাতৃগর্ভ হইতে শুকদেব হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের বিষয়েও ঐরূপ এবং উহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর কথার আলোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়ে, অতুল বাবুর ন্যায় দ'লো সাধারণী নিশ্চয়ই সে বিষয়ে তারস্বরে আপত্তি করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না। কারণ রাজা ও মহর্ষি সাধারণ সমাজের পীর পেযাগম্বরে পরিণত হইয়াছেন কিনা। অতুল বাবু কি বলেন, একেই মোরা ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য। অতুল বাবুর ন্যায় উকিলকে আসন গ্রহণ করাইতে আমাকে বাধ্য হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ও সাধুগণের জীবনের back groundটাতে দৃষ্টিপাত করিতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

সর্ব্বত্র সকল সত্যের আলোচনা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে যাঁহাদিগকে প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে নিক্তির তৌলে ওজন করিয়া সত্যপরায়ণ হওয়াই ধর্ম্মের কাজ, যিনি তাহা না করিবেন, তিনি যিনিই হউন, ধর্ম্মের চক্ষে, বিধাতার চক্ষে অপরাধী। শাস্ত্রী মহাশয় এই হিসাবে যে ঘোরতর অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত বুদ্ধিমান পণ্ডিত লোকেরাই বুঝেন। তাহা তাঁহার ইতিহাস-পাঠকগণের মধ্যে সত্যপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন; না করিয়া উপায় নাই। অতুল বাবু কেন যে বিকারের রোগীর ন্যায় "আবল তাবল" বকিয়া "কেঁচো খুড়িতে সাপ" বাহির করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, বুঝি না। ভাঁয়ার "হেলে ধরবার ক্ষমতা নাই, কেউটে ধরতে" এত আশা কেন? শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি একখানি certificate দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। তাই এত আড়ম্বর করিয়া প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হইয়া আসরে অবতরণ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের তাহা প্রয়োজন ছিল না। বরং এখন শাস্ত্রী মহাশয় এবং তাঁহার বর্ত্তমান অনুগত শিষ্যমণ্ডলীকে আক্ষেপভরে বলিতে হইবে "হে বিধাতা, দয়া করিয়া অতুল

বাবুর ন্যায় বন্ধুর হাত হইতে আমাদিগকে ও আমাদের গুরুকে রক্ষা কর।"

আমাদের অতুল বাবুর "আক্কেলসেলামী-রূপে আজ যে শাস্ত্রীমহাশয় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা করিতে হইল, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। আমার আলোচনা, অতুল বাবুর "ধর্ম্মাবৃত পুরুষের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার একটী কেশকেও স্থানচ্যুত করিতে পারে না," তাঁহার এই মধুর উপদেশের কি মূল্য দিব, ভাবিয়া পাই না। আমি তাঁহার অনুরোধে কেন, তৎপূর্ব্বেই বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া তবে আলোচনায় হাত দিয়াছি। সে জন্য আমার লেখনী ধারণ, আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অনেকেই, এমন কি, শাস্ত্রীমহাশয়ের নিতান্ত গুণানুরাগী সুহৃদ্ ও অন্তরঙ্গগণ এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত, তাঁহারাও অনুভব করেন, তিনি এই জীবনের অপরাহ্ণ কালে ইতিহাস লিখিতে গিয়া অনেকগুলি নিন্দনীয় কাজ করিয়াছেন। লোকে আমার আলোচিত সত্যের প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না। সকলেই জানেন, আমি অতুলবাবুর মত ইতিহাসের আলোচনায় কাব্যরস সম্ভোগে ব্যস্ত হই নাই। ঠিক ঠিক খাঁটি সত্য কথাগুলিই বলিয়াছি। প্রতিবাদ-যোগ্য কোন কথাই নাই। অতুল বাবুর মত অতিবুদ্ধিমান লোকই কেবল আমার ভাষা লইয়া "কামড়াকামড়ি করিতে ব্যস্ত হইবেন। ভাষা ত আমার, ভাষার দোষ গুণ ও আমার, তবে অতুল বাবুর মত ভাষা ফলাইবার শক্তি আমার নাই। যার যেমন স্বভাব, সে ত সেইরূপ করিবে। আমি যে বিষয়টা জানি না, অতুল বাবুর মত তাতে হাত দিই না, যে বিষয়টা জানি ও যেরূপ ভাবে তাহা অনুভব করি, ভাষাও তাহারই মত দাঁড় করাইয়া যায়। হৃদয় মনের কতটা ক্ষোভে গুরুস্থানীয় ব্যক্তির রচিত গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন ও তাঁহার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা অতুল বাবুশ্রেণীর লোকের ধারণার অতীত।

শাস্ত্রীমহাশয়ের নিজের গুরু, আচার্য্য ও উপদেষ্টার প্রতি ব্যবহারের তুলনায় আমার আলোচনা সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত হইয়াছে; কারণ আমি তাঁহার রচিত ইতিহাসের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি। "ব্যক্তিগত" কথা বলি নাই, তথাপি যদি অপরাধ করিয়া থাকি, তবে অতুল বাবুর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বলি, যে রামবনবাসে কৈকেয়ী চির-নিন্দিত হইলেও, পৌরাণিক হিসাবে কৈকেয়ীর একবিন্দু দোষ নাই, কারণ কৈকেয়ী তীব্র কঠোর না হইলে, রাবণবধ হয় না, তাই বাগ্দেবী বীণাপাণি স্বয়ং ঐ দুষ্ট ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখানে Economy of Providence সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই আমার মত অধম ব্যক্তিকে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার "ন্যায় ও ধর্ম্ম" রক্ষার জন্য ও ব্রহ্মানন্দের প্রতি শাস্ত্রীমহাশয়ের চিরপোষিত হৃদয় রত্নাকর মন্থন করিয়া সত্যরত্নোদ্ধারে বদ্ধ-পরিকর করিয়াছে।

অতুল বাবু, কেশব বাবুর পরীক্ষাগারের ঘটনাটা, ইতিহাসের বিষয় বলিয়া কি মনে করেন? আমার বোধ হয়, স্থির বুদ্ধির লোক তাহা মনে করেন না। এটা জীবনচরিতের বিষয়। এটার উল্লেখ না করিলে যে কারণে প্রতাপচন্দ্র সত্যের অপলাপকারী হইতেন, ঠিক সেই কারণে শাস্ত্রীমহাশয় ব্রাহ্মসমাজের বিবরণে স্থান দিয়া অন্যায় করিয়াছেন। ইতিহাস কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনী নহে, যাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কাজ যতটুকু

অগ্রসর বা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তির জীবনের ততটাই ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। এই হিসাবে কুচবিহার বিবাহ আলোচনার বিষয়, পরীক্ষাবিভ্রাটটা নহে। কেশবের দীক্ষাটা ইতিহাসের বিষয়, সেটা ত্যাগ করিয়া পরীক্ষাটার আলোচনা শাস্ত্রী মহাশয়ের সুস্থ মনের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। আর এক কথা এই যে, কেশব ও তাঁহার সে সময়ের ঘনিষ্ঠ দল, নানা প্রকারে শাস্ত্রী মহাশয়ের সে সময়ের স্বাধীনচিত্ততার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছেন, তাহাতে কোন মানুষের হৃদয়ের উত্তমভাব সুরক্ষিত হয় না, সেরূপ অবস্থায় বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি (ব্রহ্মানন্দ ও তদীয় দলের প্রতি) সুস্থ মনে সদ্ভাব পোষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষেও সম্ভব নহে। শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাসোক্ত লুক্কায়িত বিরূপ ভাব সেই দীর্ঘ-পোষিত হৃদয়-জ্বালার স্থায়ী প্রকাশ মাত্র। অতুল বাবুর এই সকল বিষয়ের তত্ত্ব জানা থাকলে, আমার বিশ্বাস, তিনি প্রতিবাদে অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না। কিন্তু তাই বা বলি কেন, আজকাল তাঁহার মত ব্রাহ্ম যে আর নাই, একথা ত সত্য নহে, বরং উল্টাটি ই সত্য। আর এক কথা, কোন্ শাস্ত্র অনুসারে কেশব চন্দ্রের পরীক্ষা বিষয়ক ব্যাপারটা রামতনু বাবুর জীবন-চরিতের বিষয় হইল? অতুলবাবু তাঁহার প্রতিবাদ লেখার সময়ে আমার আলোচিত রামতনু বাবুর জীবন-চরিতে উপরিউক্ত ঘটনার প্রতি দিব্য দৃষ্টি চালনা করেন নাই, ঐটি চাপিয়া গিয়াছেন। চাপিয়া না গেলে, প্রতিবাদটা জমাট বাঁধে না। প্রতিবাদ কালে বিষয় বিশেষ চাপিয়া যাওয়াও অতুল বাবুর অভ্যাস আছে। তাঁহার ভাবা উচিত ছিল যে, আমি ত তাঁহাকে সহজে ছাড়িয়া দিব না। অতুল বাবুর গুরুদেব যে কেশবের প্রাথমিক জীবনের পরীক্ষা বিভ্রাট ও দীক্ষাগ্রহণ উভয়ের মধ্যে উত্তমটা ত্যাগ করিয়া অধম বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার অসামান্য গুণসম্পন্ন লেখনী চালনায় রত হইলেন, তিনি ইহার গোপন তত্ত্বটাও অনুসন্ধান করিলেন না কেন? অতুলবাবুর এই দু'লো বৃত্তিটা, বিকৃত সাবধানতাটা কি তাঁহার ইতিহাস পাঠের ফল? তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে আঁধার ঘুচাইবার জন্য আমাকে আবার বলিতে হইতেছে, ও বিষয়টায় নেক্ নজর করিলে হয় ত প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিবাদ করার সখটা মিটাইবার আরাম সম্ভোগ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। এখন মনে হইতেছে, অতুলবাবু কেবল ডাক্তার নহেন, সত্য গোপন করিয়া নানাবিধ কল্পনার আশ্রয় করিয়া মিথ্যা মাম্‌লা খাড়া করিয়া উকিল সাজিয়া এজলাসে দাঁড়ান তাঁহার অভ্যাস আছে। বলা বাহুল্য, আমি আপাততঃ অনেক কথা হাতে রাখিলাম, অতুল বাবুর মত আর কোন মহাশয় ব্যক্তি এই প্রতিবাদ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, তাঁহার জলযোগের জন্য মজুত রাখিলাম।

এখন অতুল বাবুর আর দু একটী কথার উত্তর দিয়া আমার বর্ত্তমান কর্ম্ম শেষ করিতেছি। আমি এখনও বিশ্বাস করি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটা প্রবল শক্তিশালী জনমণ্ডলীর সমাজ হইলে, অবশ্যই শাস্ত্রী মহাশয়ের নানাবিধ অন্যায় উক্তির প্রতিকার সম্ভব না হইলেও প্রতিবাদ অবশ্যই হইত। শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা পাঠ করিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সর্ব্বত্রই এই "অধম বাঙ্গালী" অধমই আছে। আমার দারুণ মনস্তাপের গূঢ় তাৎপর্য্য অতুল বাবুর বুঝিবার সাধ্য নাই। আর কেমন করিয়াই বা বুঝিবেন? তিনি ত

দলের খাতিরে, নিজের কিছু লিখিবার খাতিরে, সত্যাসত্যের আলোচনা বিরোধী প্রতিপক্ষের সমগ্র আলোচনার অঙ্গভঙ্গ করিতে বেশ পটু। যিনি আমার আলোচনা ও অতুল বাবুর প্রতিবাদ মিলাইয়া পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে অতুলবাবু দুষ্টবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া আমার আলোচনার নানা স্থান হইতে মশিয়ানা খাটাইতে চেষ্টা করিয়া ভুল করিয়াছেন, খুব বাহাদুরী করিলেন।

অতুলবাবু অতি কষ্টে ও মনের দুঃখে স্বীকার করিয়াছেন যে, একটা "কিন্তু" চড়াইয়া আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশংসা করিতে ভুলি নাই। যে সকল স্থলে আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশংসা করা আবশ্যক বলিয়া অনুভব করিয়াছি, সেখানে অকপটে তাহা করিয়াছি কিন্তু অতুলবাবু কথিত "কিন্তু" কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। অতুলবাবু আরও বলিয়াছেন "ইহাও বলা (যাহার) উদ্দেশ্য নহে যে, ইতিহাসের অভাবাত্মক যে প্রশ্নগুলি চণ্ডীবাবু তাঁহার পত্রে উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার সকল গুলিই অসার ও বিবেচনার অযোগ্য"। আমি এই কথার উত্তরে কেবল এই বলি যে, তবে এ প্রতিবাদ লিখিয়া পাপসঞ্চয় করা কেন? আমার আলোচনার বিষয়ীভূত ঘটনা সকলের একটাও অনাবশ্যক নহে। কতক শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাস হইতে পরিত্যাজ্য, আর অধিকাংশ তাঁহার ইতিহাসে স্থান পাওয়া উচিত। কেশব ও তাঁহার দলসম্বন্ধে, নানা ব্যক্তিগত কারণে দীর্ঘকাল হইতে শাস্ত্রী মহাশয় বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহা বুঝিলাম আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মসমাজে একাধারে বহু বহু সদনুষ্ঠানের সূচনাকর্ত্তা শ্রীযুক্ত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে এরূপ নীরব কেন? সস্ত্রীক সর্ব্বপ্রথম বিলাত যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া, অশিক্ষিত লোকমণ্ডলীর শিক্ষা বিধান, নৈতিক উন্নতি সাধন এবং সুরাপান নিবারণ চেষ্টা ইত্যাদির জন্য বহুবিধ নির্য্যাতন ভোগ-বিষয়ক উপকরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতে থাকিতেও তিনি কেন সে সকল বিষয় ইতিহাস হিসাবে আলোচনা করিলেন না? এগুলি তাঁহারই মত ব্যক্তিগত জীবন ধারণের ফল হইলেও, ইতিহাস হিসাবে এ গুলি ব্রাহ্মসাধারণের ও সমগ্রদেশের মহামূল্য সম্পদ। তিনি এ সম্পদ ইতিহাসের বিষীভূত কেন করিলেন না? অতুলবাবু এ বিষয়ে কি বলেন? আমি এখনও উল্লেখ করি নাই, এমন সকল বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা দেখাইব যে, শাস্ত্রী মহাশয় ইতিহাস হিসাবে আরও কত বিষয়ের সম্ভবমত ও সঙ্গত আলোচনা ত্যাগ করিয়া ইতিহাসে, নিজের মর্য্যাদা হানি এবং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের কতটা অনিষ্ট করিয়াছেন? তাহা করিতে গেলে, এখানেই পুঁথি বড়ই বাড়িয়া যায়। এখন থাক, পরে দেখা যাইবে। আমার বিবেচনায় ইতিহাস হইতে কতক গুলি বিষয় বর্জ্জন ও অন্য নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা না থাকিলে, বর্ত্তমান আকারে ঐ ইতিহাস, বিশেষ ভাবে উহার দ্বিতীয় খণ্ড, সাধারণ সমাজের বাৎসরিক রিপোর্ট মাত্রে পরিণত হইবে। কোন ঐতিহাসিক উহার মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজের কৃতকর্ম্মের বৃহদনুষ্ঠান সকলের তত্ত্ব খুঁজিয়া পাইবে না। তাঁহার অতুল বাবুর মত দু'লো ভক্ত ও শিষ্যগণ ইহাকে "এই মাটীতে খোল হয় বলিয়া" নাচিয়া দশা প্রাপ্ত হইলেও, উহা ইতিহাস নামের যোগ্য হইবে না। ইতিহাসে যাহা থাকা উচিত, উহাতে তাহা নাই।

এই সুতীব্র ভাষায় ব্রাহ্ম-সমাজের ইতি-

হাসের আলোচনা করিয়াও আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিতান্ত অনুগত ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবনত+ তাঁহার দোষগুণ সমস্ত বিচার করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ, আমার শ্রদ্ধা ভক্তি ব্যক্তিগত, ইতিহাসগত নহে, অন্ধও নহে। সত্যের খাতিরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া আত্মীয় স্বজনের অশ্রুপাত যাহারা করায়, তাহারা কি অতুল বাবুর মত (অবশ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের মত নহে) মা বাপকে ভক্তি করে না; শাস্ত্রী মহাশয়ের আমাপেক্ষা স্নেহের পাত্রও তাঁহার এই সকল কর্ম্মের দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছেন, সে সকল লোকের নাম শুনিলে অতুল বাবুর দিব্য দৃষ্টি আকাশে উঠিবে। যাক্ আর শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাসের অন্যায় আচরণের আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ঐতিহাসিক তত্ত্বে অনভিজ্ঞ অতুল বাবু দয়া করিয়া লিখিয়াছেন, "হঠাৎ কেমন করিয়া কেশবচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার প্রতি চণ্ডী বাবুর এরূপ উৎকট প্রেমোদ্গার হইল? ইহা কি সত্য সত্যই প্রেমের অভিব্যক্তি, না ইহা একটা প্রেমের ভাণ?" আচ্ছা সম্পাদক মহাশয়, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, কোনও ভদ্র সন্তান (অবশ্য ব্রাহ্ম নহেন) অতুল বাবুর ন্যায় ইতর আক্রমণপরায়ণ ব্যক্তির কোন দণ্ড ব্যবস্থা করিলে তিনি সজ্জনের ন্যায় সে দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কি না, এ বিষয়ে আপনি কি কোন সংবাদ রাখেন? ব্রাহ্মের পক্ষে এরূপ আক্রমণ সম্ভব হইলেও, কোন ভদ্রসন্তান বিষয় বিশেষের ঠিক তথ্য না জানিয়া একজন অপরিচিত ভদ্র লোককে এরূপ অভদ্র ভাবে মিথ্যারচনা করিয়া আক্রমণ করিতে সাহস করেন কি? "উৎকট" বিবেকপরায়ণ অতুল বাবু অকুণ্ঠিত চিত্তে অবাধে "কেশব চন্দ্রের আত্মার প্রতি চণ্ডী বাবু প্রেমের ভাণ" দেখাইতেছেন, এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিলেন। অতুল বাবু কি "এল-এম-এস" ধর্ম্মাবৃত বলিয়া এতটাই আত্মহারা, তাঁহার ইহাও জানা উচিত ছিল যে, এ বিষয়েও তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ সবল ও সক্ষম, এবং সহজেই তাঁহার চৈতন্যোদয় করিবার মালমশল্লা রক্ষা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শ্রেণীর সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞানবিহীন মাৎসর্য্যভরা ব্রাহ্মেই এখন ব্রাহ্ম-সমাজ পূর্ণ হইয়া গেল। আর এই শ্রেণীর লোকই এখন শাস্ত্রী মহাশয়ের শিষ্যপদ বাচ্য হইবার অধিকার লাভ করিতেছেন, আর বলিব কি? এঁরাই এখন সর্ব্বস্ব। এখন এদেরই আমল। এখন এঁরাই "এডওপি ক্রমায়তে।"

অতুল বাবু কি একবার একটু ক্লেশ স্বীকার করিতে সম্মত আছেন, অন্ততঃ সত্যের খাতিরে? তাহ'লে তাঁহাকে একবার নব্যভারতের প্রাচীন ফাইলটা ইঁটিকাইতে হইবে। এটা ১৩১৯ সাল। তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি বৎসর অনুসন্ধান করার পরে, ১৩০৬ সালে হাজির হইতে হইবে। তাঁহা প্রায় ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বের সাধারণ সমাজের মাঘোৎসবের সময়ের তত্ত্ব-বিদ্যা সভার উৎসবে পঠিত "কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সমাজে তাঁহার স্থান" শীর্ষক মুদ্রিত প্রবন্ধটী দেখিতে পাইবেন। সেই স্থানে একবার দিব্যদৃষ্টি চালনা করিয়া পরে ঐ উপযুক্ত গালাগালি গুলি পুনরায় গলাধঃকরণ করিতে আজ্ঞা হয়, তাহা হইলেই বুঝিব যে, তিনি ভদ্রলোক, নতুবা তাঁহার ঐ অসার "পায়রা-বকমে" কেহ কর্ণপাত করিবে না, অন্ততঃ আমি নহি, কারণ ভদ্র লোকের সঙ্গে বাদ

প্রতিবাদ চলে, এরূপ অনভিজ্ঞ, অথচ জ্ঞানের অভিমানে মত্ত দু'লো লোকের সঙ্গে আলোচনা চলে না। আর উকিলের মত সত্য মিথ্যা না জানিয়া যিনি কথায় কথায় উঠিয়া দাঁড়াইতে ব্যস্ত হন, তাঁহার প্রতি আমার এই অনুরোধ যে, তিনি যাহা জানেন না, সে বিষয়ে আর এ জীবনে যেন "আত্ম-প্রচার" করিতে ব্যস্ত না হন।

নিবেদক শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলেরায় উত্তেজক।

প্রাণ শক্তি কি? ইহা আদি শক্তি, Animation or protoplasmic life এই শক্তি জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তে, স্নায়ুমণ্ডলী ও অন্যান্য যন্ত্রাদি রচনার পূর্ব্বে মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হয়। পূর্ণ চৈতন্য-শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্য শক্তির (Protoplasm) ক্রম-বিকাশ, সংযোগ ও সমষ্টি মাত্র। ইহা চেতনার স্ফুরণ করিয়া যন্ত্রাদিকে কর্ম্ম করিবার অনুভূতি ও ক্ষমতা দেয়, রাসায়নিক ক্রিয়ায় যেমন য্যাসিড ও সল্ট দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-গুণ বিশিষ্ট সামগ্রী মিশিয়া একটী নূতন পদার্থ গঠিত হয়, তেমনি, স্ত্রী-শক্তি (ovum) ও পুংশক্তি (spermatojoon) মিলিত হইয়া একটী নূতন শক্তির রচনা করিয়া থাকে। এই নূতন শক্তি কণিকা স্ত্রী ও পুংশক্তি হইতে পৃথক গুণ বিশিষ্ট। ইহা কর্ম্মশীল, বর্দ্ধনশীল ও অনুভূতির আকর, অতএব চৈতন্যময়। এই শক্তির ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ অনন্ত ভাগ বিভাগের দ্বারায় বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্য শক্তির উৎপত্তি হইতে থাকে। যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি বৃদ্ধি হয়, ততই মাতৃগর্ভ স্থিত শিশু সম্পূর্ণ বৃদ্ধি ও চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ এক আদি শক্তি-কণিকা হইতে সৃষ্টি হওয়ায়, একটী হইতে অন্যটী বিচ্ছিন্ন না হইয়া, সংশ্লিষ্ট ভাবে এক যোগে কর্ম্ম করিতে থাকে। প্রাণশক্তি রাজশক্তি, কারণ ইহার অভাবে যন্ত্রাদি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। স্নায়ুমণ্ডলী মন্ত্রী-শক্তি, কারণ এই শক্তি রাজশক্তির ইঙ্গিতে শরীরের ক্ষমতা বিধান করে। অন্যান্য যন্ত্রাদি ভৃত্য বা প্রজাশক্তি, কারণ ইহা মন্ত্রী-শক্তির আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হয়।

কলেরা রোগের সহিত উত্তেজক ঔষধের কি সম্পর্ক, তাহা বুঝিতে হইলে কলেরা রোগীর শরীরে কি কি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহা প্রথমে জানিতে হইবে। কলেরা-বিষ রক্তে প্রবেশ করিয়াই পাকস্থলীর আবরক-ঝিল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া গুহ্য পর্য্যন্ত এমন একটী উত্তেজনার সঞ্চার করে যে, উত্তেজনায় বাতাস যেমন খালি স্থান অধিকার করিতে ছুটিয়া আসে, দেওয়ালি পোকা যেমন আকৃষ্ট হইয়া অনবরত আলোতে পড়িতে থাকে, তেমনি শরীরের সমস্ত রক্তের গতি অন্ত্র ও পাকস্থলীর অভিমুখ হইয়া রক্তের জলীয় ভাগ, বিষের উগ্রতা অধিক হইলে, এমন কি, রক্ত-কণিকা পর্য্যন্ত, রক্তনলী হইতে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধ ও অধঃ হইতে থাকে, ইহাই কলেরা বিষের সাধারণ কার্য্যকরী শক্তি। কিন্তু সকল রোগীতে কলেরার বিষক্রিয়া সমভাবে প্রকাশিত হয় না। ইহা কোন কোন স্থলে হৃদ্‌পিণ্ডের অবসাদ বা আক্ষেপ দ্বারা রোগীর প্রাণ নাশ করে।

চর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আভ্যন্তরিণ যন্ত্রাদি পর্য্যন্ত শরীরের রক্তের জলীয়াংশ ক্রমাগত অন্ত্রনলীতে পড়িতে থাকে। কলেরা বিষে অন্ত্রের আবরক ঝিল্লি সরিয়া যায় ও তাহার জল-শোষণ-ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়; মৃত ঝিল্লি সমূহ রক্তের জলীয়াংশের সহিত নির্গত হইয়া শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ করিয়া ফেলে; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নূতন আবরক ঝিল্লি প্রস্তুত না হওয়ায় শোষণ ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে য, রক্তের জলীয় ভাগ শরীর হইতে অনবরত নির্গত হইতেছে। কিন্তু শোষণ ক্রিয়ার অভাবে সেই জলীয়াংশ পূরণ না হওয়ায় রক্ত-স্রোত ক্রমশঃ মন্দ ও তরল রক্ত, গাঢ় ও চাপ বাঁধিয়া যাইতে থাকে। উপরোক্ত কারণে ও রোগীর সাধারণ অবসাদ হেতু ফুশ্‌ ফুশ্‌ ও হৃদ্‌পিণ্ড সম্যক রূপে রক্ত বিশুদ্ধ করিয়া শিরায় চালনা করিতে পারে না ও সমগ্র রক্তনলীতে অপবিশ্রুত রক্ত জমিতে থাকে; অবশেষে সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায় ও দেখিতে দেখিতে নাড়ী ডুবিয়া আসে।

এখন দেখা যাক, প্রাণশক্তি, স্নায়ুমণ্ডলী ও অন্যান্য যন্ত্রাদি কি অবস্থায় শরীরের মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

প্রাণশক্তি কলেরা বিষের আঘাতে অত্যন্ত ক্ষীণ ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ও তাহার জীবনী শক্তির বিকাশ লুপ্তপ্রায় হয়। রক্তের জলীয়াংশ শরীরের প্রত্যেক বস্তির পক্ষে আবশ্যক, যে জলীয়াংশ খাদ্যাদি বহন করিয়া বা জল সিঞ্চন দ্বারা শরীরের পুষ্টি-সাধন ও কর্ম্মক্ষম করে, সেই জল ও খাদ্যের অভাবে স্নায়ুমণ্ডলী (মন্ত্রিশক্তি) যন্ত্রাদি (ভৃত্যশক্তি) নির্জ্জীব হইয়া পড়ে ও তাহাদিগের কার্য্যকারিতা-শক্তি অচিরে লোপ পায়। যতক্ষণ ভেদবমি হইতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্নায়ুমণ্ডলী ও যন্ত্রাদি জড়ের মতন চলচ্ছক্তিহীন হইয়া শরীর মধ্যে অবস্থান করিতে থাকে ও তাহাদিগের স্বাভাবিক ক্রিয়ার স্ফুরণ হয় না; ক্রমে ভেদবমি কমিতে থাকে ও প্রাণশক্তি জাগিয়া জীবনের বিপদ আশঙ্কায় সমগ্র বাহ্য প্রকৃতিকে জাগাইতে প্রয়াস পায়। এই প্রয়াসই reaction। প্রাণশক্তির ক্ষীণ ঝঙ্কারে যেন বাহ্য প্রকৃতি সজাগ হইয়া জাগিয়া উঠে ও তাহার অসীম বল আয়ুরক্ষার্থ নিয়োজিত করে। দেখিতে দেখিতে হৃদপিণ্ড ও নাড়ী ক্ষীণভাবে উঠিতে থাকে ও স্নায়ুমণ্ডলী ও যন্ত্রাদি অল্প পরিমাণে তাহাদিগের আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কিন্তু প্রাণশক্তি যদি বিষের তাড়নায় মূলে নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে এবং প্রকৃতির প্রথম উচ্ছ্বাস নির্ব্বাণোন্মুখ বাতির ন্যায় একবার দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া যায়। অথবা এইক্ষণ প্রাণশক্তি না নিবিয়া ক্ষীণতর হইতে থাকিলে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু ক্রমে হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী ক্ষীণতর হইতে থাকে ও শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়। উপরোক্ত কারণে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি দূষিত রক্তে পূর্ণ হইয়া শিথিল বা প্রাণহীন উত্তেজনার সঞ্চার করে। (অস্বাস্থ্যকর প্রয়াস) অথবা প্রাণশক্তি যদি মূলে নিষ্পেষিত না হয়, তবে তাহার প্রত্যেক স্পন্দনে স্নায়ুমণ্ডলী, হৃদপিণ্ড ও যন্ত্রাদি স্পন্দিত হইয়া ক্রমে জীবনী শক্তির স্ফুরণ করিতে থাকে। ক্রমে অন্ত্রঝিল্লি তাহার স্বাভাবিক শোষণ ক্রিয়া অল্প পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া অন্ত্রনলী হইতে রস বা জলীয় পদার্থ গ্রহণ করে ও চাপ রক্ত তরল হইয়া গতিশীল হয়; স্নায়ুমণ্ডলী, হৃদ্‌পিণ্ড ও অন্যান্য যন্ত্রাদি

জল ও পথ্য পাইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে থাকে। দ্বিপ্রহর রাত্রে কোন একটী গৃহস্থের বাটীর চারিদিকে আগুন লাগিলে যেমন গৃহকর্ত্তা হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া আশু বিপদে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়ে, কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কি করিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না, তৎপরে আরও কিছু সুস্থ হইলে আগুনের মধ্য হইতে বাহির বার উপায় চিন্তা করে ও বাঁচিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া গৃহকর্ত্তাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে; সেই উত্তেজনায় গৃহস্বামী পথ ভুলিয়া আগুনের দিকে ছুটিতে থাকে; তেমনি, বিষের প্রবল আঘাতে প্রাণশক্তির সহিত স্নায়ুমণ্ডলী ও যন্ত্রাদি মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, কিন্তু ঝড়ের প্রবল বেগ থামিলে প্রাণশক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলী ও যন্ত্রাদি ক্রমশঃ সুস্থ হইতে থাকে। প্রাণশক্তি সংজ্ঞা লাভ করিলে আকস্মিক বিপদে অধীর হইয়া উঠে ও আত্ম রক্ষার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, অথচ স্নায়ুমণ্ডলীর সম্পূর্ণ সুস্থতার অভাবে অন্যান্য যন্ত্রাদির অভাব অভিযোগের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া, রাজশক্তির ইঙ্গিতে যদৃচ্ছা অপরিমিত বলে যন্ত্রাদিকে বক্ত পথ যোগাইতে থাকে। অন্যদিকে, যেমন বহুদিন অভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অতি আহার স্বাভাবিক কিন্তু প্রাণিহানিকর, তেমনি, ভৃত্য যন্ত্রাদি অভুক্ত থাকায় বক্ত পথ্য পেটুকের মত নিজ নিজ শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে।

সুস্থাবস্থায় কোন একটী ভৃত্যযন্ত্র অহিতকর ও অপরিমিত পথ্য আহার করিতে উদ্যোগ করিলে স্নায়ুমণ্ডলী তাহার শাসন-শক্তি দ্বারা বাধা প্রদান করে; কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলী রুগ্ন ও অপ্রকৃতিস্থ থাকায় তাহার বোধ করিবার ক্ষমতা রহিত ও শাসনকার্য্যে অপারগ হয়; বরঞ্চ শেষে স্নায়ুমণ্ডলী ভৃত্য-যন্ত্রদিগকে রাজা বা প্রাণশক্তিকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে সহায়তা করিয়া থাকে। এই অবস্থায় স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনায় হৃদ্‌পিণ্ডের প্রবলবেগ, যন্ত্রাদির পথ্য গ্রহণ করিবার একাগ্রতা ও রক্তের অভাব স্থান অধিকার করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকায় ভৃত্যযন্ত্রাদিতে রক্তের গতি ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া রক্তাধিক্যতা জন্মে; প্রবল প্রয়াস অবশেষে যন্ত্রাদির প্রবাহ বা স্বাভাবিক নিঃসরণ ক্রিয়া বন্ধ করিয়া প্রাণশক্তিকে নষ্ট করে। যেখানে প্রাণশক্তি নিষ্পেষিত হয় নাই, যেখানে প্রাণশক্তির উত্তেজনায় হৃদ্‌পিণ্ড ও রক্তস্রোত বিচলিত হইয়া অন্যান্য যন্ত্রাদিতে অসমান ভাবে ধাবিত হয় নাই, যেখানে প্রাণশক্তি প্রকৃতস্থ থাকিয়া সমগ্র শরীরের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, সেই খানেই প্রাণশক্তি আপনার আত্মাকে রোগ-বিষ হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস স্বাভাবিক ও কার্য্যকরী হইয়া থাকে, সেখানে নাড়ী ডুবিয়া যায় না, বা উত্তেজনায় প্রবল হইয়া উঠিতে পারে না। (স্বাস্থ্যকর প্রয়াস), অতএব দেখা গেল যে, প্রাণশক্তি আত্মরক্ষার প্রয়াস স্বাস্থ্যকর (স্বাভাবিক) অস্বাস্থ্যকর (অস্বাভাবিক), প্রবল ও স্বাস্থ্যকর, অস্বাস্থ্যকর মিশ্রিত অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর (অস্বাভাবিক) প্রয়াস, স্বাস্থ্যকর (স্বাভাবিক) ও স্বাস্থ্যকর (স্বাভাবিক) প্রয়াস অস্বাস্থ্যকর (অস্বাভাবিক) প্রয়াসে পরিণত হইতে পারে। এই পরিণতি প্রাণশক্তির সজীবতা বা নির্জ্জীবতার উপর নির্ভর করে।

কলেরা-বিষে শরীর কিরূপে বিকৃত করে, তাহা পূর্ব্বে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে,

উত্তেজক ঔষধাদি কলেরা রোগে কি প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল। কলেরার প্রথম অবস্থায় যেমন ভেদ বমি চলিতে থাকে, উত্তেজক ঔষধাদি সে অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় যখন ভেদ বমি কমিয়া আসে, নাড়ী ক্ষীণ বা ডুবিয়া যায়, উত্তেজক ঔষধাদি সেই সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা, কলেরার দ্বিতীয় অবস্থায় শরীরের মধ্যে যে স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সম্যক রূপে বুঝিয়াছি। অতএব এখন এই অবস্থার চিকিৎসা কি? যে ঔষধ স্নায়ুমণ্ডলীর অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রশমিত করিয়া রক্তের অসমান গতি সমিত করে—না—যে ঔষধ স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়া রক্ত-সঞ্চালনের অসমতা আরও বৃদ্ধি করে? আমরা জানি, কলেরার দ্বিতীয় অবস্থায়, প্রাণশক্তি বাহ্য প্রকৃতিকে উত্তেজিত করিয়া আত্ম রক্ষার প্রয়াসী হয় ও রক্ত-স্রোত অসমান ভাবে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদিতে সঞ্চারিত হইতে থাকে। পরন্তু, এই অবস্থায় সমতা-গুণ-বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবহার না করিয়া, যদি উত্তেজক ঔষধাদি ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে রক্ত-স্রোত সেই সেই যন্ত্রাদিতে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়া সেই সেই যন্ত্রাদির রক্তাধিক্যতা বৃদ্ধি করে। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এই অবস্থার চিকিৎসাই রক্তের সমতা সম্পাদন করা, উত্তেজনা করা নহে।

এখন দেখা যাক, অন্যান্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের উত্তেজক ঔষধগুলি শরীরের মধ্যে কি রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। উত্তেজক ঔষধ মাত্রেই এই স্নায়ুমণ্ডলীর চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিয়া হৃদ্‌পিণ্ড ও রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার সমতা নষ্ট করে ও সমস্ত শরীরে রক্তাধিক্যকা লক্ষিত হয়; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনার পরিমাণ অনুসারে অবসাদ আসিয়া শরীরকে ক্ষীণ করিয়া থাকে। সমতাই যখন আমাদিগের চিকিৎসার লক্ষ্য, তখন যে ঔষধ উত্তেজনা না করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য স্থির বা ঠাণ্ডা রাখে, এমন ঔষধ ব্যবস্থাই এই অবস্থার চিকিৎসা। বারান্তরে saline সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার।

কেশব ও রামকৃষ্ণ।

ভারতের পর্ব্বত-কন্দরে, শৈল-শিখরে এমন অনেক যোগী ঋষি রহিয়াছেন, লোকে তাঁহাদিগকে জানেনা, অথচ ধর্ম্মরাজ্যে সাধনা বিষয়ে তাঁহারা অতি অগ্রসর। জগৎ তাঁহাদিগকে জানেনা, জানিবারও আবশ্যক নাই, কারণ জগতের গোলমাল, স্বার্থ ও প্রতিযোগীতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া তাঁহারা কেবল আপনার মুক্তি সাধনের জন্যই ব্যস্ত। তাঁহারা থাকিলে বা মরিলে জগতের কিছুই আসে যায় না। বোধ হয় যেন কোন নিজের অসম্পূর্ণ কার্য্যসাধনের জন্য তাঁহারা বসিয়া আছেন, সেটী শেষ হইলেই তাঁহারা চলিয়া যাইবেন। জগৎ থাকুক আর অধঃপতে যাউক, তাহাতে তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই।

যখন ভারতে নানা উপদ্রব, অলীক

কুসংস্কার, ধর্ম্মের অত্যাচার ও নানা ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছিল, তখনও তাঁহারা লোকের অনুসরণের বাহিরে অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখর দেশে কোন গহ্বর মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া কৃপণের ধনের ন্যায় আপনার ধর্ম্মধন রক্ষা করিতেন। এসমস্ত লোকের জীবন জগতের জন্য নহে, জগৎও তাঁহাদের জন্য নহে। আত্মমুক্তিই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু যখন ধর্ম্মবিপ্লব হয়, যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ভগবানের বিশেষ নিয়মে এক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহাদের জন্মে জগৎ ধন্য, বসুন্ধরা পুণ্যবতী, এবং যাঁহারা কেবল জগতের উদ্ধারের জন্যই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েন, তাঁহারা প্রেরিত।

ভারতে বিদেশীয় লোকের আবির্ভাবে যখন ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া আর্য্য ধর্ম্ম বিপন্ন হইয়াছিল, তখনই ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি বলেই হউক, অথবা ঈশ্বরের প্রেরণায়ই হউক, এমন এক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদিগকে প্রকৃতই ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা তৎকালের দর্শন বিজ্ঞানে, বিদ্যাবুদ্ধিতে অসাধারণ কৃতীত্ব প্রাপ্ত হইয়া উপধর্ম্ম ও বিপ্লবকে বিদূরিত করেন। যখন মুসলমান-আধিপত্যের সময়ে এক ঈশ্বরের নাম করিয়া বহু কুসংস্কার ও অত্যাচার ধর্ম্মের নামে ভারতকে মথিত করিতেছিল, তখন পঞ্চনদে নানক ও বঙ্গে শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়া হিন্দু আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব জগতে সংস্থাপন করিলেন। সকলেই সে ইতিহাস অবগত আছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ভারত মুসলমানের শেষ অত্যাচারে পর্য্যুদস্ত হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে নানা ধর্ম্মবিপ্লব, স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারে সমাজের বক্ষ বিদারিত হইতেছিল, তখন এই মৃতকল্প বঙ্গদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। সে বিপ্লব সামান্য বণিক ইংরাজ জাতিকে ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর করিয়া দিয়াছিল। এই বিপ্লবের শেষভাগে অদ্বিতীয় মনীষা-সম্পন্ন রাজা রামমোহন ভগবান কর্ত্তৃক আহূত হইলেন। এবং নিজের প্রতিভা ও ভগবানের অন্তঃপ্রেরণা বলে সকল সম্প্রদায়ের সম্পূজ্য একেশ্বরবাদ নূতন আকারে বেদ উপনিষদ ও কোরাণের ভিত্তিতে রোপিত করিলেন।

কিন্তু এই বিরাট সাধনা এক মহাপুরুষের শক্তিবলে সম্পন্ন হইল না। রামমোহনের দেশবাসী রামমোহনকে ভুলিয়া গেল। তাঁহার নামে কলঙ্ক আরোপ করিল। তিনি তাঁহাদের অবহেলায় সপ্ত সমুদ্র দূরবর্ত্তী অচিন্ত্য প্রদেশে নিজের মানবলীলা শেষ করিলেন, ভারতে সে সময়ে কেবল কয়েকটী বন্ধুর চিত্তে ভিন্ন আর কোন হৃদয়েই একটু সহানুভূতির অশ্রু আসিল না। একজন অষ্টম বর্ষের বালক মাত্র কালে সেই প্রকাণ্ড মহীরুহের শাখা রূপে বিরাজ করিতেছিল, আর একজন বয়োবৃদ্ধ তাঁহার জ্বালিত প্রদীপটী রক্ষা করিতেছিলেন।

সেই স্ফুলিঙ্গ মাত্র অবশিষ্ট বিপ্লব-বহ্নি কিরূপে আবার ভীষণ তেজে সমস্ত জগতে বিস্তৃত হইল, কেমন করিয়া রামমোহনের অনুষ্ঠিত মৃতপ্রায় সত্য আবার ফল ফুল কাণ্ডে শোভমান হইয়া জগতে অদ্বিতীয় শক্তি বিস্তার করিল, তাহার ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, জগতের সভ্যতার ইতিহাসের এক নূতন বল্লী, আজ সেই বিষয়ই বলিব।

রাজা রামমোহনকে লোকে ভুলিয়া

গেল। দুই একজন পণ্ডিত ইংরাজ ও দুই একজন বাবু তাহার জন্য শোকাশ্রু ফেলিতেছেন। যেমন রজনীর অবসানে পূর্ব্বদিক লাল রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া প্রচণ্ড রবিকিরণ সমুদিত হয়, সেইরূপ এই বঙ্গের গঙ্গানদী-বিধৌত পবিত্র প্রদেশে এক মহাপুরুষের সমাগম হইল, তিনি জন্মিয়াই দেখিলেন কি? ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিয়াছে, খ্রীষ্টান পাদরীগণ নানা কলঙ্ক আরোপ করিয়া ভারতের ধর্ম্মকে পদ দলিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এদিকে চির-অবিশ্রান্ত মুসলমান ধর্ম্ম নূতন নূতন ভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের বিলোপ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে (ওয়াহেবী সম্প্রদায়)। এদিকে ডিরোজিও নামক অতুল প্রতিভা-সম্পন্ন শিক্ষকের ছাত্রগণ, মদ, মাংস, স্বাধীন প্রেম প্রচার ও দেশীয় আচার ব্যবহার পদদলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুরা-রাক্ষসীর প্রচণ্ড প্রভাব তাণ্ডব রবে নৃত্য করিতেছে, আবার দলে দলে শিক্ষিত স্বাধীন-চেতা লোক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইউরোপীয় আচার ব্যবহারে দেশকে প্লাবিত করিতেছে। তখন একজন স্বর উত্থিত করিলেন, "Youngmen, it is for you" আবর্ত্তময় ভীষণ তরঙ্গ যেন বাণের প্রভাবে মন্দীভূত হইল। সেই যুবার প্রবল স্বর-লহরী মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় ভারত-গগনে প্রতিধ্বনিত হইল। যাঁহারা ভাবিতেছিলেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা একেশ্বরবাদের প্রকাণ্ড মহীরুহতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। (Life of D. M Das) দলে দলে শিক্ষিত যুবকগণ এই মহাত্মার পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করিল, (Conversion of Sivanath, A. M Bose & 20 graduates)। সুরাপান ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অস্ত্র উত্থিত হইল, মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির আবদ্ধ সুরাপানের বিরোধী আন্দোলন শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া ব্যণ্ড-অব-হোপ রূপে কত কত শিক্ষিত যুবককে সংযম ও ধর্ম্মপথে আনয়ন করিল। স্বাধীন উন্মার্গগামী সম্প্রদায়, যাহারা তাধিয়া তাধিয়া রবে ইউরোপের প্রচারিত তালে তালে নৃত্য করিতেছিল, সম্মুখে তাহারা বিরাট বাধা প্রাপ্ত হইয়া একবার চাহিয়া দেখিল, তাহাদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। তখন বিলাত-ফেরতা, এবং গাছে না উঠিতেই এক কান্দি, এরূপ অর্দ্ধ বিলাতী সম্প্রদায় ভারতীয় সমাজে আবার দাঁড়াইবার স্থান প্রাপ্ত হইলেন। এতদিন ইউরোপ ভারতে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রচার করিত, আমেরিকা ভারতকে খ্রীষ্টান করিতে আসিত, এবার ভারতের ধর্ম্ম ইউরোপকে আক্রমণ করিল, আমেরিকায় সে পতাকা উড্ডীন হইল। কে সেই মহাত্মা, যাঁহার প্রভাবে এই সকল পরিবর্ত্তন হইল? তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

জাতি উর্দ্ধে উঠিলেই অনেকের চক্ষু টাটায়। ইতিহাস সত্যকে কখনও অপলাপ করে না। সুতরাং সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে যে, অনেকের চক্ষু টাটাইল। কি, আমরা এম এ পাশ, কেহ বিলাত ফেরতা, কেহ হাইকোর্টের বড় এডভোকেট, আমাদের নাম হইবে না, আর এই লোকটা আমাদের সকলের উপরে উঠিবে। অমনি তাঁহার দলে প্রতিক্রিয়া আসিল। যে জন্য জুলিয়াস সিজার তাঁহার বন্ধুগণের হস্তে পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন, যেজন্য বায়েজিদ তাহার প্রথম সহায় কর্ম্মকার ও তাহার পুত্রবৎ পালিত যুবার হাতে পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন, সেইরূপ শিষ্যগণ, যাঁহারা এক সময়ে তাহার মহত্ত্ব কীর্ত্তনকে জীবনের ব্রত

বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাই আবার তাঁহাকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন এক কাণ্ড হইল, ভাগীরথীতে বান্ধ পড়িল, পদ্মানদী নিম্নভূমি পাইয়া জাঁকিয়া উঠিল। প্রথমে কৃষ্ণপ্রসন্ন, শশধর, পরে রামকৃষ্ণকে দাড় করান হইল।

মিত্রগণ কেশবের বিরোধী হইয়া তাঁহার সকল সৎকার্য্যের মধ্যে একটী "কিন্তু" আরোপ করিলেন। বিশেষ শিক্ষিত সম্প্রদায় কোন ক্রমে ভারতে চির-প্রচলিত নরপূজার প্রশ্রয় দিতে পারিলেন না। বিজ্ঞান ও দর্শন লোককে অন্ধবিশ্বাস হইতে রক্ষা করে। এ দিকে প্রতাপবাবুর কেশবের জীবন-চরিতে অলক্ষ্যে একটী দাগ লিখিত হইয়াছিল। তাহাতে রামকৃষ্ণের নিকট হইতে মাতৃভাব কেশবের হৃদয়ে একটী প্রভাব উৎপন্ন করিয়াছে। ইংলণ্ডের লোক, যাঁহারা কেশবের একটু দোষ পাইলে ১০ গুণ করিত, (Life of Keshub, Lethbridge) এবং ম্যাকসমূলার-প্রমুখ ইংরেজগণ তখন কেশবের এক গুরু ঠাহরাইলেন। 'তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস। আমরা সে সময়ে কলিকাতায় ছিলাম। তখন শুনিলাম, কেশব বাবু এক সাধুকে দেখিয়াছিলেন, তিনি বেশ ভক্ত, কালীনাম করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হয় এবং সামান্য ভাষায় অনেক ভাল ভাল কথা বলেন। আমরাও দুই একদিন তথায় গিয়াছিলাম। আমি দেখিয়া আসিলাম, কিন্তু তেমন মহত্ত্ব কিছু বুঝি নাই। একজন উচ্চপদস্থ লোক তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "a fit subject for Dr Payne's Lunatic asylum." শুনিলে জিভ কাটিতে হয়, তবে তখনকার লোকের যে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল, তাহা জানাইবার জন্যই এ কথা বলিলাম। পরে কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত, ধর্ম্মবিষয়ে শিশু ব্যক্তিগণ ইংরেজীতে মাক্সমূলারের প্রশংসা, ও তাঁহার প্রতি কেশব বাবুর অনুরাগকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে একেবারেই পয়গম্বর করিয়া তুলিলেন। বেচারী রোগে জরাজীর্ণ, তথাপি শিষ্যগণের বিরাম নাই, "ঠাকুর তুমি কি পরব্রহ্ম, ঠাকুর তুমি কি পরব্রহ্ম?" সরলহৃদয় রামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, "বেটা, দেখিস, আমি পচিয়া গলিয়া মরিতেছি। বলে কিনা, ঠাকুর আপনি কি পরব্রহ্ম?"

কেশবের শিষ্যগণ জানিতেন. মানুষ কখনও পরব্রহ্ম নহে। অবতারবাদের তাঁহারা প্রতিবাদী বরং যাহাতে তাঁহারা কেশব অবতার বলিয়া গণ্য না হন, এজন্য নরপূজার বিরুদ্ধে ও অন্যান্য গুরুবাদ শীর্ষক কত প্রবন্ধ লিখিতেন, এমন কি, তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য তাঁহাকে পাইলেই খোঁচা না দিয়া ছাড়েন নাই। সুতরাং কেশব লোক-লোচনে অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন না, কেশবের বন্ধুগণ ও শিষ্য প্রতাপচন্দ্র টাউনহলে এই মহা বাক্য বলিয়াছিলেন,—

"Keshub's life shows what an ordinary man can do by self-cuture and devotion"

এদিকে কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানহীন ও চরিত্রহীন লোক, যাহারা ব্রাহ্ম কি অপর কোন ধর্ম্মসমাজে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত, * * * * * * তাহারা একেবারে রামকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম করিয়া তুলিল। এডিসনের ট্যাটলারে আছে Arian ও Plutarch নামক দুই জন ঐতিহাসিক যশের মন্দিরে স্থান না পাইয়া শাসাইয়াছিলেন, They would bring in one who would alone defy all of them toge-

ther and they brought Cato of Atica. সেই প্রকার, এই সমস্ত লোক ব্রাহ্মসমাজে স্থান না পাইয়া বলিল, তোমরা ব্রহ্ম ব্রহ্ম কর, দেখ একটা পরব্রহ্ম উপস্থিত করিয়া দিতেছি।

মনস্বী উমেশচন্দ্র বটব্যাল একদিন বলিয়াছিলেন, "যে দেশে নরপূজার এত প্রভাব, যে রামকৃষ্ণ কাল মরিয়াছে, আজই সে পরব্রহ্ম হইয়াছে।" এইরূপ চৈতন্যের সময় অনেক লোক একজন হাড়িকে বিষ্ণুর অবতার করিয়া লইয়াছিল। আমি জানি না, বটব্যাল মহাশয়ের সে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে কি না।

ইংরাজীতে একটী কথা আছে, For one true prophet, there arise 20 false prophets.

আমরা স্বচক্ষে সে দিন স্বদেশী মেলায় দ্বাদশজন ধর্ম্মনেতার ছবি দেখিলাম, তাহাতে রামকৃষ্ণ, শ্যামানন্দ, কৃষ্ণানন্দের ছবি আছে, কিন্তু কেশবচন্দ্রের ছাব নাই।

রামকৃষ্ণ দলের ইহা একটী কৌশল, কারণ তাঁহার নাম করিতে হইলে রামকৃষ্ণকে যিনি মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন, যাহার শক্তিতে সামান্য যোগী মহাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার নাম করিতে হয়, এজন্য তাহা করেন নাই, বুঝিলাম। হায় রামকৃষ্ণ, কেশবের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তুমি বলিয়াছিলে যে "আমি আর কেশব এক; তবে আমাকে ছাড়িয়া কেশব কেমন করিয়া মরিল।" আর তোমার ভ্রান্ত শিষ্যগণ কেশবের নামেই বিরক্ত।

সে যাহা হউক, জগতে গুরুগিরির এমনি প্রভাব, আমরা সংবাদ পত্রে শুনিয়াছিলাম যে, একজন লোক কতকগুলি শিষ্যকে তৎপথে চালিত করিয়া শেষে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়াছিল। ভারতে সকলই সম্ভব।

আমরা, যদিও তুলনীয় নহে, তথাপি কেশব ও রামকৃষ্ণকে তুলনা করিব।

পূর্ব্বে যে সমস্ত লোকের কথা বলিয়াছি,—যাহারা বনে বনে নিজের জন্য ব্রহ্ম সাধন করিতেন, রামকৃষ্ণ সেই দলের। তাঁহারা নিজের, জগতের নহেন।

যে সমস্ত লোক জগতে "পরিত্রাণায় সাধুনাং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" জন্ম গ্রহণ করেন, বা ভগবৎ-শক্তিতে প্রেরিত হয়েন, কেশব তাহাই।

রামকৃষ্ণ অশিক্ষিত, অনেক আবল তাবল বলিতেন, যাহার মধ্যে কোনটা লিখিবার উপযুক্ত, কোনটা বাজে কথা।

কেশব জগতের একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা, তাঁহার বক্তৃতা, তাঁহার উপদেশ, চিরকাল ধর্ম্ম-সাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। "When Keshub speaks, the world listens"

রামকৃষ্ণ নিজের, ধর্ম্মবিপ্লব হউক, সমাজ-বিপ্লব হউক, রাণী রাসমণির ঘাট তাঁহার সুরক্ষিত দুর্গ।

কেশব জগতের, জগতের ধর্ম্মবিপ্লব, জগতের ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম বিনাশ করিবার জন্য আহূত। রামকৃষ্ণ হিন্দুর, আজি কি না হিন্দু হিন্দু বলিয়া অতি বিকৃত চীৎকার উঠিয়াছে তাই কেশবকে বিলুপ্ত করিয়া রামকৃষ্ণকে লোকে খাড়া করিতেছে।

কেশব জগতের, জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি এক মহান বিধান আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য প্রতাপচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"Keshub's aspiration was to Hinduise

Hinduism and Christianity christianity" তিনি সকল ধর্ম্মের সার সঙ্কলন করিতে আসিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ কতকগুলি অল্পশিক্ষিত লোকের তাক্ লাগাইবার জন্য আসিয়াছিলেন।

কেশব দেখিলেন, একধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ ও যুদ্ধ, ঈশ্বরের এক সন্তান তাঁহার নামে অন্যকে বধ করে, হিংসা করে, ভাবতে এই অশান্তি অতি ভীষণ ফলপ্রদ। তাই তিনি এমন বিধান আনিলেন, যাহা Prof Vaswanir ভাষায় বলিতেছি—

"It is Hinduism and something more, Christianity and something more, Buddhism and something more" অর্থাৎ সকল ধর্ম্মের অনুপূরক, জগতের এক মহা ধর্ম্ম।

তিনি জগতে নানাবিধ বিকৃত মত দূর করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সন্ন্যাসিগণ আমাদের দেশে কাপালিকরূপে, চোর, দস্যু, তস্কর ও বিপ্লবকারীরূপে বিরাজ করিত, (সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ দেখ।) কেশব এই সন্ন্যাস ধর্ম্ম উঠাইয়া রাজর্ষি জনক প্রভৃতির অনুষ্ঠিত সংসারকে প্রকৃত ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

"নাহি মূর্ত্তি পূজা বিধি, বনবাস সন্ন্যাসাদি।" কিন্তু একদল লোক এই সন্ন্যাস ধর্ম্মের মায়া ছাড়াইতে পারিলেন না। যদিও ইউরোপ যেছুট পাদরীগণ, মঙ্ক ও নানগণ কর্ত্তৃক কত মহাপাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যদিও আমাদের দেশে এই সন্ন্যাসীগণ, বৈরাগীগণ আজও পাপ ও ব্যভিচারে জগৎ উৎসন্ন করেন, তথাপিও আবার সেই বিবাহহীন সন্ন্যাস ধর্ম্ম আনিতে চান। যেন পাপের ভরা এখনও পূর্ণ হয় নাই। আমি যখন বগুড়ায় ছিলাম, তখন এইরূপ একটী ঘটনা দেখিয়াছিলাম, শিষ্য এক পাপে জেলে গেলেন, কিন্তু গুরুর জেলায় প্রকাশ করিলেন যে গুরু ও শিষ্য মাতা ও পুত্রীর প্রেমপাত্র জগতে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। তুমি অবতার হও, বা নিজে নিজে পরব্রহ্ম হও, সেই এক সনাতন, নিখিল-প্রসবিতা অনন্ত দেবতার মহান প্রভাব, তাহার বৈজ্ঞানিক নিয়ম লঙ্ঘন করিবার শক্তি তোমার হইতেই পারে না। তুমি কে? দাম্ভিক মানব, অহঙ্কার কর, আর মনে মনে যাহাই ভাব, তাঁহার নিকট তুমি কীটাণুকীট মাত্র। তোমার উত্তোলিত আকাশের মন্দির একদিন বিধাতার শাস্তিতে বিচূর্ণিত হইবেই হইবে। চিরদিন জগতে ধর্ম্মের জয়, নীতির জয় হইয়াছে। সুবিধার ধর্ম্ম এক প্রকার। সাধুতার ধর্ম্ম আর এক প্রকার। আমার অভ্যস্ত পাপ থাকিয়া যাউক। আমি যাহা আছি, তাহাই থাকি, অথচ আমার যদি আঙ্গুল ভাঙ্গিলে, কি চক্ষু উলটাইয়া বসিলে, কি হঠাৎ অজ্ঞান হইতে পারিলেই ধর্ম্ম হইল, তবে আর লোকে এত ক্লেশ করিয়া ধর্ম্ম করে কেন?

সাধুতার ধর্ম্ম অন্য প্রকার। পাপের জন্য পাপের অনুতাপে তাহাদের প্রাণ জরাজীর্ণ হয়, চীৎকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাপের জন্য তাহারা ক্রন্দন করে, যতদিন তাহাদের হৃদয় পবিত্র না হয়, ততদিন তাহারা নিজকে কোন মতেই ক্ষমা করে না। জগাই মাধাই তাহাদের পাপের কথা জগৎ সমীপে কীর্ত্তন করিত, তাই জগতে তাহারা সাধু। চৈতন্যের নামের পূর্ব্বে লোকে জগাই মাধাইএর নাম করে। St. Paul বলিয়াছিলেন, "Oh great sinner that I am, who shall deliver me from this body of death."

তাই পল খ্রীষ্ট-জগতে ধন্য। আর আমি পাপ করি, যাই করি না কেন, একটু উপায়ে fit হইয়া পড়িলেই ধার্ম্মিক হইব। এ প্রকারের ধর্ম্ম hysteria-রোগ।

রামকৃষ্ণের দলে অনেক লোক অনেক সাধু অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ভারতে এরূপ সাধু অনুষ্ঠান বৌদ্ধগণ, বৈষ্ণবগণ ও ব্রাহ্মগণও যথাসাধ্য করিতেছেন। জগতে যাহারা সাধু কার্য্য করে, তাহারা ধন্য, তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে প্রশংসা করি। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন বণ্ডডার সেই পাপিষ্ঠের ন্যায় কেহ কার্য্য না করেন।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম তো নর-পূজার ধর্ম্ম, তথাপি তাহার কয়েকটী গুণে তাহা প্রশংসিত। প্রধান গুণ এই, তাহাতে কতকগুলি নীতি-বিষয়ক বচন আছে। সকলের হউক না হউক, কিন্তু নৈতিক জীবন তাহাদের অনেকের অতি উচ্চ এবং এই কারণেই জগতে তাহার এত প্রভাব। আবার তাহার দোষ যাহা, তাহাও লোকের চক্ষু অতিক্রম করিতেছে না।

এই নীতিই জগতে সকল ধর্ম্মের সার। যে লোক ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, অথচ কার্য্যে নানারূপ পাপ করে, তাহার ধর্ম্ম কথার কথা মাত্র। এই ধর্ম্ম ও নীতি উভয় একত্রিত হওয়াতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রশংসিত। "ইনি মিথ্যা বলিবেন না, কারণ ইনি ব্রাহ্ম।" এ বিশ্বাস অনেকেরই আছে। যদি কোন ধর্ম্ম এইরূপ প্রশংসার পাত্র হইতে পারে, তবে তাহার বিশেষ গৌরব, সন্দেহ নাই।

আর একটী কথা, একজন বলিয়াছেন, "আল্লার কিরে মুই হ্যান্দু।" এই হিন্দুনামের অহঙ্কারে অনেকে কেশবকে, যিনি নববিধান নাম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তুচ্ছ করেন। আমি হিন্দু নাম, আমাদের গৌরবের নাম মনে করি না। আমাদের নিকট ম্লেচ্ছ নাম ঘৃণিত। মুসলমানের নিকট হিন্দু নাম ঘৃণিত। ইহা, দাসত্বের পদবী, চোর দস্যু ও অধার্ম্মিক, এমন হিন্দু নামের আমি পক্ষপাতী নই। কিন্তু আর্য্য নাম আমাদের গৌরবের নাম। কেশব নিজেকে "The Aryan Disciples of New Dispensation বলিয়াছেন। এই আর্য্য নাম গৌরবান্বিত বলিয়াই ইউরোপীয়গণ এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আর্য্যই হউক, আর হিন্দুই হউক, জিজ্ঞাসা করি, ভাই হিন্দু, যে সময়ে হিন্দু সন্তান খ্রীষ্টান পাদরীর বক্তৃতায় বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন, সে সময় তোমাদের হিন্দু ধর্ম্মকে কে রক্ষা করিয়াছিল? এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন খ্রীষ্টান পাদরী মনে ভাবিতেন, একদিন না একদিন শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই খ্রীষ্টান হইবে। সেই খ্রীষ্টানের নর-পূজার, অনন্ত নরকের বিভীষিকাময় বিচারের দিনের যুক্তিহীনতা দেখাইয়া কে আবার পৈতৃক ধর্ম্মের দিকে টানিয়াছিল? কেশবচন্দ্র সেনকে ধন্যবাদ যে, আজিও তোমরা হিন্দু রহিয়াছ।

ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংসকে তুলনার জন্য যদি কিছু নামাইয়া দিয়া থাকি, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি, কিন্তু "Save me from my freinds" কথাটী যেন সকলের মনে থাকে। বরং পণ্ডিত শত্রু ভাল, মূর্খ মিত্রও তুচ্ছ। শিষ্যগণের দোষেই আমাকে মহাত্মা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে হইল।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বর্ষা।

আলোকে আঁধারে বৃদ্ধ গগনে
বজ্রে বিজয় বাজনা বাজায়।
কোলাকুলি করে অনল সলিলে
উজল বিজলী বরষা-ধারায়॥

উড়িছে চঞ্চল মেঘ নীলাঞ্চল
চরণে সজল শ্যাম তৃণদল,
তমো নীলাম্বরে ঢাকি কলেবরে,
আঁধার রজনী অঘোরে ঘুমায়॥

বাদল বাতাস খেলায় পাগল
লুকে লুকে ছুটে মিষ্ট ধারাজল,
কত কোলাকুলি করে তরুদল
কহে—প্রেম-কথা শাখায় শাখায়॥

শাখী শাখে বায়ু গাহে সব সব,
মৃদু কলরবে গাহে জলধার
বরষার ভাষে আঁখি মুদে আসে
শীতল বাতাসে দোলা দিয়ে যায়॥

নূতন ধারায় জীবন জেগেছে
সিক্ত মাটীর সুবাস ছুটেছে.
সুপ্ত মাঠের গোপন বীজেরে
বরষা নীরবে ডাক দিয়ে যায়।

খেয়া।

অন্তহীন কাল, তথাপিও পারানা কি,
দূর দূরতর ঐ পরপার রেখা?
কুহেলী আবৃত যেন দেখিনু নয়নে
সেই দিন একবার, নিমেষের দেখা;
আশা-কুহকিনী সত্যই সে দিন আসি
দেখাইল কুহেলী বিদারি। আজি পুনঃ
ঢাকি রেখা গভীর আঁধারে, কেমনে বা
অদৃশ্য করিয়া তারে ফেলেছে মুছিয়া।
যাত্রিগণ করতালী দিয়া "আসিয়াছি"
"আসিয়াছি" বলি, উল্লাসে সাপটি ধরি
বহিত্র বাহিতেছিল আত্মহারা হ'য়ে।
হা বিধাতঃ! আজি তারা চাহেনা ওপারে।
মাঝ খানে খেয়া রাখি বহিত্র ছাড়িয়া,
তরণীর কুক্ষি মাঝে গভীর নিদ্রিত।
কভু কভু স্বপ্নাবেশে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
নাচিছে বিকট নৃত্য; "যাবনা যাবনা"
বলি উঠিছে কাঁদিয়া; অট্ট হাসি' কভু,
"ফিরাইয়া লও মোরে" কহিছে গর্জ্জিয়া।
রুদ্ধ ভাষে জিজ্ঞাসিনু "যাবেনা। যাবেনা?
অভাগা ভুলেছে সব কিছু নাহি মনে।
উত্তরিল সবে মোরে প্রেত সমস্বরে,
বিস্ময়ে যেনরা, "কে তুমি? কি হেতু হেথা?
কোথা যাব। কে যাইবে? আমরা কে? বল।'
আমি কহিনু যখন "হাটে হাটে ফিরি
ঐ দেখ আনিয়াছ অশেষ পসরা,—
ওপারে নিবাস তব, যাবেনা কি তথা?"
অমনি ঘুমাল সবে নাহি কোন কথা।
নীরব নিস্তব্ধ নদী কূলে কূলে ভরা,
পড়িয়া রহিল নায়ে অশেষ পসরা।

শ্রীশশধর রায়।

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়।

পরম পণ্ডিত তুমি সাধু মহামতি,
বিনয়ের অবতার উদার হৃদয়,
সরল নির্ম্মল মন প্রেমামৃতময়,
হে গৌরগোবিন্দ! তুমি শুদ্ধ শান্ত অতি।
ঋষি সম শুদ্ধাচারী উন্নত সাধক,
আদর্শ পুরুষ তুমি পরম ধার্ম্মিক:
জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত, যোগী, মহান, প্রেমিক,
নববিধানের তুমি আদি প্রচারক।
স্বধর্ম্ম প্রচার করি নির্ভয় হৃদয়ে,
গিয়াছ হে উপাধ্যায়! শান্তি ধামে তুমি;
পরম মঙ্গলালয়ে সুখ শান্তি লয়ে,
থাক দেব। যোগ্য স্থান নহে বঙ্গভূমি।
ক্ষুদ্র দেহে মহা প্রাণ করিয়া ধারণ,
পালিয়াছ ধর্ম্মকর্ম্ম বীরের মতন।

শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন।

প্রার্থনা

হে মোর প্রাণেশ, নিশা যথা লয়ে' তার
অন্তহীন রাশি রাশি গাঢ় অন্ধকার,
সাগ্রহে পোষণ করে আলোর প্রার্থনা
জাগাইয়া কৃষ্ণ-বক্ষে নির্ব্বাক-বেদনা,
আমিও তেমনি সখা, রজনীর মত
লয়ে' মোর পুঞ্জীকৃত অপরাধ যত
বসে' আছি তোমারে চাহিয়া। একবার
এস প্রাণে দিব্য বেশে, দেবতা আমার,
নবীন লাবণ্যে আমি উঠিব ভরিয়া—
আঁধার রজনী যথা উঠে উজ্জ্বলিয়া
ভাস্বর কিরণে শুভ্র শুচি-স্নাত হয়ে'
প্রদীপ্ত-ময়ূখ মালী দিব্য সূর্য্যোদয়ে।
তপনের প্রয়োজন যেখানে আঁধার
এস তাই, তমোময় এ চিত্ত-আগার।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরত্ন।

স্মৃতি।

নিভিবার পূর্ব্ব ভাগে দীপ
ঢালে তার সব খানি হাসি।
শেষ হাসি হেসে চলে যায়,
পরে থাকে অন্ধকার রাশি।
শুষ্ক হয় নীহারের কণা
হীরক সদৃশ জ্যোতি ঢেলে,
শেষ স্মৃতি পরে থাকে তার
চিহ্ন মাত্র মৃত্তিকার কোলে।
দিবাকর ডুবিবার আগে
সব হাসি ঢালে রক্ত রাগে,
সন্ধ্যার মলিন ছায়া শুধু
তারি সেই স্মৃতি নিয়ে জাগে,
জগতের শেষ স্নেহরাশি
মানবের শ্মশানেতে জ্বলে,
মুষ্টিমেয় ভস্ম থাকে শেষ
স্মৃতি তার মৃত্তিকার কোলে।

শ্রীবিভাবতী সেন।

একা।

নিবিড় কানন মাঝে
চলিনু মনেতে ভয়—
দুই পাশে তরুরাজি
কাছে নাহি লোকালয়।

আঁধার ঘেরিয়া আছে
আকাশে জ্বলিছে তারা,
খদ্যোৎ ঘুরিছে পাশে
মম সম পথ-হারা!

মর্ম্মরিছে তরুরাজি
সূচীভেদ্য অন্ধকার,
সহসা খুলিয়া গেল,
পূর্ব্বাশার রুদ্ধ দ্বার।

আলোক পশিল চোখে,
পাইনু পথের রেখা—
মিলিল অনেক সাথী,
এবে আমি নহি একা।

মুহূর্ত্তে হইল দেখা,
ক্ষণ মাত্রে পরিচয়,
এবে দেখি বহু জন।
আমারি আত্মীয় হয়।

দেখিনু আশার আলো,
শুনিনু আশার গান,
বলিল একটী সাথী
"তুমি আমি এক প্রাণ।

সেই সুর সেই কথা
অমিয় ঢালিল প্রাণে,
নব ভাবে পথ বাহি
চলিলাম দুই জনে!

জীবনের দীর্ঘ পথে
বহু কথা বিনিময়,
ছায়া সম ছিল তার
সাহচর্য্য মধুময়।

সহসা পেছনে পরি,
পড়িল সাথীটী মোর,
বলিল ডাকিয়া মোরে
বড়ই কাতর স্বর,—

"অগ্রসর হও তুমি,
আমি যাই সরে দূরে,
মিলিব উভয়ে সখে
মরণের পরপারে!"

চাহিনু ফিরায়ে আঁখি
ভাঙ্গিল চমক মোর
একাকী দাঁড়ায়ে আমি
পথ-রেখা দীর্ঘতর ॥

চলিয়াছি সেই পথে,
পেছনে ফিরিনি আর,
ঘুরিতে ঘুরিতে পথে
পুনঃ সেই অন্ধকার।

নিবিড় কানন মাঝে
আবার চলিনু,—ভয়,
দুই পাশে তরুরাজি
কাছে নাহি লোকালয়।

আঁধার ঘেরিয়া আছে,
আকাশে জ্বলিছে তারা,
পাদ্যেৎ ঘুরিছে পাশে
মম সম পথহারা।

মর্ম্মরিছে তরুরাজি
সূচীভেদ্য অন্ধকার,
একাকী চলেছি পথে
সাথে কেহ নাহি আর ॥

শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য।

ও পারে!

এ পারেতে অনিয়ত ভবের গণ্ডগোল।
ও পারেতে শান্তিময়ের শান্ত মধুর কোল।
দেখা যে তার মোহন ছবি
হাসি মুখে ডুবুছে রবি,
ধীরে ধীরে তরুর শিরে হাসছে কিরণ পরি।
গগন ভরা রঙ বিরঙের লঘু মেঘের তরী।

(২)

মেঘ সেজেছে পাহাড় গুলা * সম্মুখেতে তারি,—
স্নিগ্ধ মধুর কিরণ মাখা কৃষকের এক বাড়ী।
বাড়ীর কাছে সরিষা খেতে,
হলুদ বরণ আঁচল পেতে,
বসে আছেন হাসি মুখে প্রকৃতি সুন্দরী।
রূপেতে দিক উজল করি শান্তি বুকে ধরি।

(৩)

ঠিক আমাদের বাড়ীর ধারে এম্‌নি একটী বাড়ী,
(বর্ষায়) গগন সাজায় মেঘের পাহাড় পিছন দিয়ে তারি।
আশ্বিন মাসে বাড়ীর পাশে,
ফুল গুলো সব ফুটে হাসে
ধরার বুকে হলুদ বসন কি অপরূপ মরি।
শান্তি সদা শান্ত মনে থাকেন বিরাজ করি।

(৪)

দেখে শোভা, ভাবতে মোর হৃদয় গেছে ছেয়ে,
সুপ্ত হিয়া নয়ন মেলি বেড়ায় মধুর গেয়ে,
"সঙ্গে করি কবে খেলা,
ভাসবে আমার জীবন-ভেলা
ভব নদীর ও পার যেতে আকুল অধীর হয়ে,
আসবে মোরে শান্তিময়ের শান্তি ধামে নিয়ে।"

শ্রীজগদীশ চন্দ্র রায়গুপ্ত।

* ময়মনসিংহ নগরের এ পার হইতে গিরিশিখর-মালা মেঘবৎ দৃষ্ট হয়।

ভালবেস না মানবে।

(১)

ভালবাস ওই নক্ষত্র মণ্ডল।
সুনীল আকাসে সুধাংশু বিমল ॥
রবি শশী গ্রহ উপগ্রহ সবে।
মন তুমি ভালবেসনা মানবে ॥

(২)

ভালবাস ওই তরুণ তপন।
প্রভাত কিরণে জুড়াবে নয়ন ॥
প্রতিদিন ভবে সমুদিত হবে।
মন তুমি ভালবেসনা মানবে ॥

(৩)

ভালবাস ওই সুখের গোধূলি।
দিনমনি যবে অস্তাচলে চলি ॥
আরক্ত নীলিমা আকাশে রাজিবে ॥
মন তুমি ভালবেসনা মানবে ॥

(৪)

ভালবাস ওই বিশাল মেদিনী।
শ্যাম শষ্প ভরা—নয়ন-রঞ্জিনী ॥
হেরিলে হৃদয় পুলকিত হবে।
মন তুমি ভালবেসনা মানবে ॥

(৫)

ভালবাস ওই দেবতা-রঞ্জন।
কুসুম কলিকা—মনো-বিমোহন ॥
সৌরভে যাহার জগত পূরিবে।
মন তুমি ভালবেসনা মানবে ॥

(৬)

ভালবাস ওই লতা গুল্মগণ।
রুচি রুচি পাতা সোণার বরণ ॥

ল'যে বঙ্গ ভবে সমীর খেলিবে।
মন তুমি ভালবেসনা মানবে॥

(৭)

ভালবাস ওই গিরি প্রস্রবণ।
তরঙ্গ-ভঙ্গিম নন্দনদিগণ॥
পূর্ণিমার চাঁদ হৃদয়ে নাচাবে।
মন তুমি ভালবেসনা মানবে॥

(৮)

ভালবাস ওই পঞ্চম পূরিত।
মন-প্রাণহরা বিহঙ্গের গীত॥
শ্রবণে হৃদয় পুলকিত হবে।
মন তুমি ভালবেসনা মানবে॥

(৯)

ভালবাস ওই নীল পারাবার।
গভীর হৃদয়—অসীম—অপার॥
প্রগাঢ় প্রণয়ে,—প্রতিদান দিবে।
মন তুমি ভালবেসনা মানবে॥

(১০)

ভালবাস ওই হর-মনোরমা।
শ্মশানবাসিনী মুক্তকেশী—শ্যামা॥
আঁধারে অন্তর আলোকিত হ'বে।
মন তুমি ভালবেসনা মানবে॥

(১১)

ভালবাস ওই মুরলী-বদন।
কদম্বের তলে রাধিকা-রমণ॥
হৃদি-বাস-মঞ্চে সতত দুলিবে।
মন তুমি ভালবেসনা মানবে॥

(১২)

স্বার্থপূর্ণ নর—মানবের মন।
কঠিন—চঞ্চল,—সদা সর্ব্বক্ষণ॥
মজায়ে অবলা ডুবায় অর্ণবে॥
তাই বলি ভালবেসনা রানবে॥

(১৩)

(যদি) প্রাণের সহিত হৃদি বিনিময়ে।
ভাল কেহ বাসে পবিত্র প্রণয়ে॥
সসীম ছাড়িয়া অসীমে মিলিবে।
মন তুমি ভালবেস সে মানবে॥

শ্রীসরোজিনী ঘোষ।

নীরব সাহিত্য-সেবক।

নীরবে চন্দ্র সূর্য্যের উদয়, নীরবে অস্ত-গমন,—কথা নাই, ভাষা নাই, বাণী নাই, আড়ম্বর নাই, শব্দ-চাতুর্য্য নাই। চন্দ্র সূর্য্য জগতের নিয়ামক—কি মহাকার্য্য নীরবে সাধন করিতেছে, ভাবিলে বিস্ময়ে হৃদয় মন পূর্ণ হয়। এই পৃথিবী যে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা, এবং ধনধান্যে পূর্ণ, চন্দ্র সূর্য্যই তাহার একমাত্র কারণ। বলিহারী বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

আর অপূর্ব্ব সৃষ্টি সাহিত্য-পরিষদ ও সাহিত্য-সভা। বঙ্গসাহিত্য-জগতের নিয়ামক কে? যে সকল মহারথী জীবনের রক্ত-বিন্দু ঢালিয়া ঢালিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছেন এবং যাইতে-ছেন, তাঁহারাই নিয়ামক;—তাঁহারাই সাহিত্য-জগতের চন্দ্র সূর্য্য। কতজন আসিলেন, কত জন নীরবে গেলেন,—ফেলিয়া গেলেন কি? তাঁহাদের চরিত্রাভাস, পুণ্যজ্যোতি, সাহিত্য-সেবাপরায়ণতার পূত স্নিগ্ধতা। তাঁহাদের চরিত্রজ্যোতি—সূর্য্য, সেবা-পরায়ণতার স্নিগ্ধতা চন্দ্রের মাধুর্য্য। দেখিয়া দেখিয়া আমরা অবাক্ এবং আত্মহারা। বঙ্গ-সাহিত্যের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি-প্রহেলিকা!

রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-আলোক যখন নিবু নিবু, তখন জাগিলেন কে? তখনও ত সাহিত্য জগৎ তেমন করিয়া জাগে নাই! তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য চলে নাই—তখনও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি শিক্ষিতগণের তেমন ভালবাসা জন্মে নাই, তখনও সাহিত্য-পরিষদ ও সাহিত্য-সভার অভ্যুদয় হয় নাই। তখন যাঁহারা সাহিত্য-সেবা-ব্রত লইয়া জাগিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম করা যায়। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার

কাহারও কথা পূর্ব্বে আমরা প্রচার করিয়াছি, এখনও যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কথা সকলেই জানেন, কিন্তু যাঁহারা সম্প্রতি চলিয়া গেলেন, তাঁহারা কে কে? রামমোহনকে জাগাইতে জাগিলেন ঈশানচন্দ্র বসু, অক্ষয়কুমারকে জাগাইতে জাগিলেন মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, সাহিত্য-পরিষদ ও সাহিত্য-সভাকে জাগাইতে জাগিলেন বিনয়কৃষ্ণ দেব, আর শিবাজীর স্বার্থত্যাগ ও দেশানুরাগ জাগাইতে জাগিলেন সখারাম গণেশ-দেউস্কর। বিনয়কৃষ্ণ বাদে, আর তিন জনই অতি দরিদ্র, তাঁহাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র ও ক্ষুধা নিবারণের অন্ন নাই, শীতাতপ নিবারণের গৃহ নাই। তবু তাঁহারা অবিশ্রান্ত খাটিলেন, অমানুষী বিক্রম প্রকাশ করিলেন, তাঁহাদের জ্যোতিতে বাঙ্গালা ভাষা জাগিয়া উঠিল, দেশ ধন্য হইল। তাঁহারা আজ বঙ্গাকাশকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। হায় বঙ্গভূমি, হায় আমরা! আর কত বিচ্ছেদ সহ্য করা যায়?

তাঁহারা ত চলিয়া গেলেন? রাখিয়া গেলেন কি? রাখিয়া গেলেন তাঁহাদের পূত চরিত্রের ছায়া, জীবন-ব্যাপী মহাতপস্যার ফল সাহিত্য-সভা ও সাহিত্য-পরিষদ, এবং আরও কত কত অমূল্য পুস্তক। যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর তাঁহাদের জ্যোতিতে বঙ্গাকাশ পণ্য-ঔজ্জ্বল্যে ভূষিত হইয়া থাকিবে। আজ শোক-দগ্ধ হৃদয়ে সংক্ষেপে তাঁহাদের কিছু কিছু পরিচয় দিতেছি।

১। ঈশানচন্দ্র বসু। ২৮শে আশ্বিন, ১৩১৯, সোমবার রাত্রি ১২টার সময় উনসত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। তিনি মেদিনীপুরের লোক। যৌবনে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট মেদিনীপুরে ব্রহ্ম-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হন। মহর্ষি তাঁহাকে প্রচারক পদে বরণ করেন। এই উদ্দেশ্যে ঢাকা ও এলাহাবাদে গমন করেন। তিনি রামমোহন রায়ের রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে প্রকাশ করেন। তিনি নীতি শিক্ষা প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি নীতিগ্রন্থ আছে। তিনি স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার "নারীনীতি ও স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ভবানীপুরের কাঁসারীপাড়ার হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয় তাঁহার দ্বারা স্থাপিত। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নব্যভারত, নবজীবন, জন্মভূমি, ভারতী ও মেদিনী-বান্ধবে প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি কিছুদিন কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক ও ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত দৈনিক "প্রভাতীর" সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা, অক্লান্ত-পরিশ্রমী লোক বড় দেখা যায় নাই। তিনি চিরদারিদ্র্যে নিপীড়িত ছিলেন, কিন্তু কখনও উৎসাহহীন হন নাই। দেশসেবা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এরূপ অদম্য কর্ম্ম-পিপাসা এদেশে বড় বিরল। তিনি যে ইতিহাস-সমুদ্র মন্থন করিয়া একখানি চার্ট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের কার্য্যালয়ে তাঁহার একখানি আছে। তিনি কোন কোন কর্ম্মী ও লেখকের ন্যায় ঢাক ঢোল বাজাইয়া কোন কাজ করিতেন না। নীরবতা তাঁহার চরিত্রের মহাব্রত ছিল। তাঁহার ন্যায় ধীর এবং স্থির-প্রকৃতি, ধর্ম্মপূত অমায়িক নিরহঙ্কার মূর্ত্তি বড় অধিক দেখা যায় না। তাঁহার পবিত্রতার আভাস পাইয়া আমরা মোহিত হইতাম, দেশ-সেবার পিপাসার পরিচয়ে তন্ময় হইতাম। তাঁহার অভাবে মেদিনীপুর এবং বঙ্গভূমি বিষাদে পূর্ণ হইয়াছে।

২। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মৃত্যু কালে অগ্র হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে মহেন্দ্রনাথের অভ্যুদয়। এই রাধানগর মহাত্মা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। যে গোশালার নিকটে রামমোহনের জন্ম হইয়াছিল, তাহা মহেন্দ্রনাথ একদিন কত আদরে আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন! রামমোহনের জন্ম স্থানের নিকটেই বিদ্যানিধির ভবন। একদিন তাঁহার পবিত্র

ভূমিতে তাঁহার সংস্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। মহেন্দ্রনাথ আজীবন অকপট সাহিত্য-সেবী ছিলেন। ঘোর দারিদ্র্য-সংগ্রাম একদিকে, অন্য দিকে সাহিত্য-সংগ্রাম, মধ্যে অটল অচল ভাবে মহেন্দ্র নাথ দাঁড়াইয়া। এক দিনের জন্যও, দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাত সহ্য করিয়াও, এই ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই। যখন বিনয়কৃষ্ণ সাহিত্য চর্চ্চার জন্য সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন মহেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন। সে নিষ্ঠা, সে উদ্যম, সে অদম্য চেষ্টা যত্ন চিরদিন আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ও অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত লিখিয়া তিনি যে সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অনন্য-সাধারণ। তিনি পুরোহিত পত্রের সম্পাদক ছিলেন। নব্যভারত প্রভৃতিতে রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য বিষয়ে বহু গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি রামমোহনের হস্তাক্ষর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত ও নাট্যশালার ইতিহাসের উপাদান তিনি সংগ্রহ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে বাসনা আর পূর্ণ হইল না। পূর্ণ হইলে বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত উপকার হইত।

৩। সখারাম গণেস-দেউস্কর। জন্ম করো গ্রামে, ১৯২৬ সংবতের পৌষ মাসে, শুক্লা চতুর্দ্দশীতে। মৃত্যু ৮ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩১৯। ৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। সখারাম বাল্যকালে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপর ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর অবস্থা-পীড়নে পাঠ ছাড়িয়া ঐ স্কুলের শিক্ষক হন। ইতিহাসের অনুশীলন তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। তিনি মহারাষ্ট্রের ইতিহাস ও ছত্রপতি শিবাজীর জীবনচরিতের উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি নানা পত্রিকায় সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতেন। সখারাম বৈদ্য-নাথের এক হাকিমের বিরুদ্ধে হিতবাদীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার স্কুলের চাকরী যায়। সেই সময়ে হিতবাদীর সম্পাদক ৺ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁহাকে হিতবাদী আফিসে কাজ দেন। তিনি শেষে স্বীয় প্রতিভাবলে হিতবাদীর সম্পাদক হন। ১৯০৮ খ্রীঃ প্রারম্ভে সুরাট-কংগ্রেস ও শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের সমর্থন উপলক্ষে "হিতবাদী"র স্বত্বাধিকারীদের সহিত তাঁহার মতভেদ হয়। এই জন্য তিনি হিতবাদীর সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। তৎপর ন্যাসানল-কাউন্সিলের বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার ও ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু "দেশের কথা" পুস্তক যখন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়, তখন এই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপর আবার কিছু দিন হিতবাদীর সম্পাদক হইয়াছিলেন, কিন্তু রোগের তাড়নায় তাহা ছাড়িতে বাধ্য হন। তাঁহার পুস্তক—(১) দেশের কথা (বাজেয়াপ্ত), (২) বাজীরাও, (৩) আনন্দীবাঈ, (৪) মহামতি রাণাডে (৫) এটা কোন্ যুগ, (৬) ঝান্সির রাজকুমার, (৭) তিলকের মকদ্দমা (বাজেয়াপ্ত)।

দেশের কথা বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি হাইকোর্টে বাজেয়াপ্ত-আইনের অবৈধতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মকদ্দমা করিয়াছিলেন। এক দিন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, যদি আমার ন্যায় সামান্য লোকের দ্বারা এই মহা কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে কৃতার্থ হইব। কিন্তু হায়, তাহা আর হইল না। তিনি বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেন। সে সকলে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে।

সখারাম মহারাষ্ট্রীয় জাতি হইতে উদ্ভূত, কিন্তু তাঁহার পিতৃকুল বঙ্গে আসিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গেই সখারামের উদয়, বঙ্গেই অস্ত-গমন। বর্গীর প্রতি বাঙ্গালীদের চিরবিদ্বেষ ছিল, বোধ হয়, সেই চিরবদ্ধমূল বিদ্বেষ দূর করিতেই বঙ্গে সখারামের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কোন সময়ে বর্গীর দ্বারা বঙ্গে যদি সহস্র সহস্র অত্যাচারও হইয়া থাকে, বঙ্গের উন্নতির জন্য এই এক মহাত্মার জীবন-পাতেই তাহা ক্ষালিত হইয়াছে। সখারাম বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহার

তুলনা নাই। বাঙ্গালী এমনই অকৃতজ্ঞ যে, এহেন মহাপুরুষের কথাও "বঙ্গ-ভাষার লেখক" নামক পুস্তকে উল্লিখিত হয় নাই। এরূপ অবিচার-পূর্ণ পুস্তক আর কখনও দেখি নাই। ঐ পুস্তকে ঈশানচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, দেউস্কর, বিনয়কৃষ্ণ, কাহারও কথা নাই। অথচ বিহারীলাল সরকার, পঞ্চানন তর্করত্ন, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি জীবিত লেখকদিগের নাম আছে। ইহা যেন বামানৈন্দিক ও বৈবেন্দ্রিক আত্ম-ঘোষণার পৌনঃপৌনিক অভিনয়। হায় রে সম্পাদক!

দেউস্কর, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য আজীবন কঠোর তপস্যা করিয়া পূত-সাহিত্য-নিষ্ঠার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। এমন নির্ভীক, উদার এবং সচ্চরিত্র লেখক যে কোন দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে। তিনি বাঙ্গালী ও মাহারাষ্ট্রীয় জাতির মিলনের যেন মধ্য বিন্দু। ঐ জাতির মহত্ত্ব প্রচার করিয়া তিনি আপনি ধন্য হইয়াছেন, বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এরূপ গবেষণা, কৃতীত্ব, ভাষার মাধুর্য্য বড়ই বিরল। যে তাঁহার পুস্তক পড়িয়াছে, সে-ই "ধন্য ধন্য" বলিয়াছে। তিনি নীরবে মহারত সাধন করিয়া "অমরত্ব" লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িকতা ও চরিত্র-মাধুর্য্য কখনও আমরা ভুলিতে পারিব না।

৪র্থ। রাজা বিনয়কৃষ্ণ। জন্ম ১৮৬৬ খ্রী। মৃত্যু ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৯, ১লা ডিসেম্বর ১৯১২, রবিবার বয়স ৪৭ বৎসর। তিনি রাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও মহারাজা কমলকৃষ্ণের পুত্র। বিনয়কৃষ্ণ ধনীর সন্তান, সুখ-শয্যায় লালিত পালিত, কিন্তু তিনি বিনয়ের অবতার, তাঁহার অগ্রজ নীলকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্রে অনুপ্রাণিত। দুটী ভাই যেন বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতে আসিয়াছিলেন। যেমন বিনয়, তেমনিই বিশুদ্ধ চরিত্র, তেমনই দেশানুরাগ, তেমনই সংস্কার-প্রিয়তা। ধনীর গৃহে এরূপ পুণ্যশ্লোক লোকের অভ্যুদয়, এক বিচিত্র ঘটনা। আমরা যতই ভাবি, ততই অবাক্ হইয়া যাই। এই বঙ্গে বিনয়কৃষ্ণের ন্যায় গুণীর আদর, লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ-বিসম্বাদ-পূর্ণ বড় ঘরের কোন সৎ পুত্র করিতে পারেন নাই। সকল গুণীকে মহামিলনে একত্রিত করিবার জন্যই যেন তাঁহার আগমন হইয়াছিল। শত্রু মিত্র, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-মূর্খ, যুবা-বৃদ্ধ, সকলকে এমনই প্রেমে আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আহ্বানে এদেশে এক মহা ব্যাপার ঘটিল। বাঙ্গালা ভাষা তখন জাগিতেছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহার হতাদর,—সহানুভূতি ও উৎসাহের পরিবর্ত্তে, ঠাট্টা, বিদ্রূপই মিলিত। এখনও প্রকৃত-সাহিত্যসেবিগণ যে ঘোর দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত, তাহার কারণই ঐ উপেক্ষা ও হতাদর। তিন মহাত্মা এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা এই কলঙ্ক অপনয়নে বদ্ধপরিকর। এক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, দ্বিতীয় আশুতোষ, তৃতীয় বিনয়কৃষ্ণ। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা চালাইয়া অমর হইলেন, মণীন্দ্রচন্দ্র, বিনয়কৃষ্ণও সাহিত্যের পরিপোষক হইলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দ্বারে যাইয়া কোন সাহিত্যিক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, শুনি নাই। যাহাকে সকলে উপেক্ষা করিত, তিনি তাহাকেও সাহায্য করিতেন। এক রক্ষক ছিলেন তিনি, আর রক্ষক মণীন্দ্রচন্দ্র। আর বিনয়কৃষ্ণ? তিনি এই বঙ্গের সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। আজ যে দিগ্বিজয়ী গৌরবে বাঙ্গালা সাহিত্য গৌরবান্বিত, বিনয়কৃষ্ণই তাহার কারণ। তিনি ১৩০১ সালে সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, নিজ বাটীতে আশ্রয় দিলেন, এজন্য কত চেষ্টা, কত স্বার্থত্যাগ করিলেন। কিন্তু এদেশের লোকের প্রাণে যেন তাহা সহ্য হইল না, তাঁহার সম্মানকে খর্ব্ব করিবার জন্য, তাঁহার অনুপস্থিতির সময়ে পরিষদকে (১৩০৭ সালে) স্থানান্তরিত করিলেন। মণ্ডলী গঠনে তাঁহার যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতা বলে অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রচন্দ্র এবং আরো কত গুণী, মানী, ধনী তাঁহার সহায় হইলেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা, এ গৌরব সর্ব্ব-গৌরবের শিরোভূষণ। তাঁহার সকল গৌরব মানুষ কালে ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা কখনও ভুলিবে না।

কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র কীর্ত্তি নয়।

তিনি যেমন দুঃখী দরিদ্রের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতেন, এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে, বিদ্যাসাগর, মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং দ্বারকানাথের তিরোধানের পর বড় শুনা যাইত না। তিনি দরিদ্রের দুঃখ মোচনে সদা বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই জন্যই বেনেভোলেণ্ট-সোসাইটী তিনি স্থাপন করেন। এই সভা দ্বারা কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি যে উপকৃত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। তিনি গরীব দুঃখীর মা বাপ ছিলেন।

তিনি একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ছিলেন। তাঁহার জীবিত কালে এদেশে যে সকল সংস্কার হইয়াছে, তাহার মূলে তিনি ছিলেন। বঙ্গের পার্টিসনের সময় হইতে তিনি নেতাদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন তিনি তাঁহাদিগের সহিত একাত্মক ছিলেন, সকল কাজে তাঁহার যোগ ছিল।

তিনি হিন্দুর সমুদ্র যাত্রার একমাত্র পক্ষপাতী হিন্দু নেতা ছিলেন। এই কার্য্য সাধনের জন্য তিনি মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা যে অভিমত বাহির করিয়াছিলেন, তাহা এদেশের অক্ষয় মন্ত্র। এ সম্বন্ধে তিনি যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নানা প্রবন্ধ ও "পঞ্চ পুষ্পের" সহিত মিলিয়া চিরকাল রাজার জয় ঘোষণা করিবে। তিনি এক জন আদর্শ সংস্কারক।

ইহা স্বত্বেও তাঁহার আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সম্পদা পাইতেন। এই রাজকুলের সর্ব্ববিধ মহাকার্য্য তিনি প্রফুল্লতার সহিত সাধন করিতেন।

ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও যিনি কাঙ্গাল দরিদ্রের প্রাণের বেদনা বুঝিতে পারেন, তিনি অসামান্য মানুষ—মানবকুলে দেবতা। তাঁহাকে সময়ের অনুধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার আবির্ভাবে শোভাবাজারের রাজবংশ ও তৎসহ বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে।

তিনি কি ছিলেন, কেমন ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন। তিনি দেবোপম, অনিন্দিত চরিত্র লাভ করিয়া এদেশের ধনী বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূত নাম এদেশে অক্ষয় হউক।

একে একে আমরা চারি মহাত্মার নাম করিলাম—৪ জনই চরিত্রের অবতার। তাঁহাদের চরিত্রে কখনও কালিমার রেখাপাত হয় নাই। দেবধামের ৪ জন মহাত্মা বাঙ্গালা ভূমি এবং বাঙ্গালা ভাষাকে গৌরবান্বিত করিতে আসিয়াছিলেন, নীরবে সাহিত্য সেবা ও দেশের পরিচর্য্যা করিয়া, সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এদেশবাসী যদি তাঁহাদিগকে ভুলিয়া যায়,' দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই দারুণ শোকের দিনে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তিনি শোক-সন্তপ্ত পরিবার-সকলে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

"স্বধর্ম্ম।"

"স্বধর্ম্ম" নামক পুস্তকের প্রচারক শ্রীমৎ লক্ষ্মণ মজুমদার। আমরা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখি নাই, তাঁহার সহিত আমাদের কোন পরিচয় নাই, কিন্তু তাঁহার "স্বধর্ম্ম" পাঠ করিলে বোধ হয় যে, তিনি একজন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ঋষিকল্প সাধুপুরুষ। ধর্ম্মসমন্বয়ের জন্য পূর্ব্বকাল হইতে, কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টাদি মহাপুরুষগণ অনেকানেক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইনি ব্যতীত প্রোক্ত বিষয়ে কেহই কৃতকার্য্য হন নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই

* ৩০শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ সাহিত্য-সভায় এক মহা অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায়, সাহিত্যসভার স্থায়ী সভাপতি হইলেও, কি মহত্ত্ব গুণে সুসঙ্গের মহারাজা সভাপতি হইলেন, আমরা বুঝিতে পারি নাই। যে সভায় সার গুরুদাস, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র পণ্ডিত কামাখ্যানাথ, প্রমথ নাথ এবং বহু প্রাচীন সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন, সেই সভায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক সুসঙ্গের মহারাজা কোন্ সাহসে সভাপতি হইলেন, ভাবিয়া আমরা আকুল।

পুস্তক খানি যদ্যপি ইংরাজীতে কিম্বা ইউরোপে প্রচারিত হইত, তাহা হইলে, এই মহাত্মার নাম যে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর পুণ্যশ্লোকবর্গাভিধান শ্রেণীভুক্ত হইত, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তবে কিনা জীবিত কালে সাধু পুরুষদের সম্মান প্রতিপত্তি বড় একটা দেখা যায় না। গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে:—"যদ্যপি ধর্ম্মোস্তি বহেৎ স্বধর্ম্ম প্রকৃতো ধর্ম্মঃ। যদ্যপি সর্ব্বোপযোগী ধর্ম্ম একোহি বিদ্যতে। তদা স্বধর্ম্ম এবস্যাৎ বিচারেণান্যমন্যতে। যদি বা সত্য শাস্ত্রঞ্চ বিদ্যতে হি প্রকথ্যতে। তদাহি জ্ঞানম্বিজ্ঞানম্প্রজ্ঞাবাপি সুসম্মতং। একমাত্রং সত্য শাস্ত্রং জ্ঞায়তাং ধর্ম্মবিত্তমৈঃ। যদ্যপি ধর্ম্মমতস্য মীমাংসাস্তীতি কথ্যতে। স্বধর্ম্ম প্রকৃত এব শেষমীমাংসকৈরহি। ধর্ম্মস্য চাপি বিজ্ঞেয়ঃ প্রকৃতোহি সমন্বয়। গায়ের কেতাবমিদং গুপ্তসর্ব্বজনশ্রুতং।" শাস্ত্রসাগরমন্থনে গীতামৃতের উদ্ভব, কিন্তু এই "স্বধর্ম্মই" গীতার পূর্ণত্ব। বলিয়াছি, আমাদের সহিত স্বধর্ম্ম প্রচারকের লেখালেখি বা দেখাদেখি নাই, সুতরাং অত্যুক্তির কোন সন্দেহ কেহ করিবেন না। একজন বাঙ্গালীর প্রতিভা দ্বারা এরূপ একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই দেখাইতেছি মাত্র, আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। পুস্তক খানি একবার পাঠ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। টেকষ্টবুক-সোসাইটির জনৈক মেম্বরের সম্পর্কিত আমার কোন বন্ধুর বাড়ীতে এই "স্বধর্ম্মের" এক কাপি আমি দেখিতে পাই। পুস্তক পাইয়া বড় গ্রাহ্য করিলাম না। কিন্তু বন্ধু বলিলেন, আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এই "স্বধর্ম্ম' পৃথিবীর এক অভিনব সম্পদ।" এই পুস্তকের নিম্নলিখিত দুই একটী মাত্র উপদেশ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার ভাব কিরূপ অভিনব ও চিন্তাপূর্ণ এবং আমার বন্ধুর ও আমার এই পুস্তক সম্পর্কীয় অভিমত সত্য কিনা;—

"প্রথমে মানবোবৃক্ষঃ অস্তীত্যেবং বিবেচয়। নাস্তিকাস্তিকোদ্দেশাগে তস্মাদ্বৃক্ষাৎ সমুদ্ভূতে॥ তাভ্যাং প্রকাণ্ডশাখাভ্যাং বিভিন্ন মতরূপক। হিন্দুকোবণিকাশ্চৈব খৃষ্টানো মুদায়ী স্তথা॥ পুত্তল পূজকাশ্চেতি বহু শাখাঃ সমুদ্ভবাঃ। তাভ্যঃশাখাভ্যো ভূয়োপি বৌদ্ধশাক্তাশ্চ তান্ত্রিকাঃ॥ সোর জৈনগাণপত্য সুম্নিসিসাস্তথৈবচ॥ প্রোতেস্তান্‌কেতলিক্ ইত্যাদি বহুসংখ্যকাঃ। উপশাখা সমুদ্ভূতা বিভিন্না ভুবি বিশ্রুতাঃ॥ প্রত্যেকাভ্যঃ প্রশাখাভ্যঃ শত সহস্র সংখ্যকং। মতকিশলয়োৎপন্ন বহুলং ভুবি বিস্তৃতং॥ তস্মিন্ কিশলয়ে পত্রং ভিন্ন ভিন্ন মতাত্মকং। এবন্তং সমস্ত পন্নমতাৎ ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাতি। ক্ষুদ্রমতেহিগমনং কুর্ব্বন্তঃ সর্ব্বোহিজনা। স্বমতে হি গতাস্তস্কে সুতরামেব দৃশ্যতে। স্বমতং হি সমাশ্রিতা আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ॥" ইত্যাদি।

আর একটী শ্লোকের অনুবাদটী পাঠ করিয়া দেখুন,—

"দ হনাদি অনন্তের স্বধর্ম্ম, কোরাণ প্রচারাদি মহম্মদের স্বধর্ম্ম, বৌদ্ধমত প্রচারাদি বুদ্ধদেবের স্বধর্ম্ম, প্রেম বিতরণাদি চৈতন্যদেবের স্বধর্ম্ম। অন্যান্য জ্ঞানিদের ধর্ম্মাদি তাঁহাদের কার্য্যাদি দর্শনে জানা যায়। যাহারা বলে, আমরা ঈশ্বরধর্ম্মী, তাহারা সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখে না যে, যখন তাহাদের নিকট ঈশ্বরের কোন ধর্ম্মই নাই, তখন তাহারা কিরূপে ঈশ্বরধর্ম্মী হইতে পারে? কেহ কেহ বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা দেখেন না যে, যখন নির্ব্বাণপথ আবিষ্কারাদি বুদ্ধের তিল মাত্র ধর্ম্মও তাহাদের নাই, তাহারা বুদ্ধধর্ম্মী কিরূপে হইতে পারে? তুমি একব্যক্তির শিক্ষার যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণে সক্ষম হইলে বলিয়া কি একেবারে তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গেলে? একব্যক্তি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে শিখিয়াই যদি তুমি তাহার ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যাও, তবে ত অপরাপরের ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াও আপনার পরিচয় দিতে হইবে, কারণ, ধর্ম্মাদি বিষয়ক শিক্ষাত কেবল একব্যক্তি হইতে হয় না।"

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৫০। হাসন্-হোসেন। শ্রীবেবতীমোহন সেন প্রণীত, মূল্য ।৵০। হাসন-হোসেন হজরত মহম্মদেব কন্যা ফতেমা বিবিব পুত্র। ফতেমা বিবিব স্বামীব নাম আলী, তিনি মদিনার বাজা ছিলেন। তিনি পবম ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। হাসন-হোসেন উপযুক্ত পিতা মাতাব উপযুক্ত পুত্র। এজিদ মাবিযাব পুত্র, দামস্তেব বাজা। এজিদ জযনাব নামক এক মহিলাব সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইযা জযনাবেব স্বামী আবদুল জব্বাবকে স্ত্রী ত্যাগ কবিতে বাধ্য কবে। জযনাব ঘটনাক্রমে হাসনকে বিবাহ কবেন। এই জন্য এজিদ হাসন-হোসেনেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবেন। কিন্তু যুদ্ধে পবাস্ত হন। এজিদেব সৈন্যাধ্যক্ষ মাবোয়ান পবাস্ত হইযা মদিনাব আশে পাশে থাকিযা চক্রান্তে প্রবৃত্ত হয। হাসনেব আব দুই স্ত্রী ছিলেন—হাসনেবানু ও জাএদা। জাএদা সুন্দবী কিন্তু নিঃসন্তান। তাহাব হৃদয হিংসায ভবা। মাবোযান মাযবুনাব সাহায্যে জাএদাকে হাত কবে, এবং বিষ প্রযোগে হাসনকে বধ কবে। হোসেন শোকে দুঃখে অস্থিব হইযা দেশত্যাগী হইবাব বাসনায কুফায যাত্রা কবেন। জাএদা দামস্কে নীতা হইযা এজিদেব হস্তে প্রাণ হাবায়। মাবোযান নানা চক্রান্ত কবিযা হোসেনকে কুফার বাজা জেযাদেব চক্রান্তে ফেলে। ঘটনা ক্রমে হোসেন কুফাব পবিবর্ত্তে কাববালায সসৈন্যে উপনীত হন। কাববালা মরুভূমি বিশেষ। কাববালাব পশ্চিমবাহী একমাত্র ফোবাত নদীব জল ভিন্ন আব কাববালাব সৈন্যদেব তৃষ্ণা নিবাবণেব উপায় ছিল না। এজিদেব লক্ষ্য সৈন্য এই নদী বক্ষায় তৎপব হয। এখানে ক্রমে ক্রমে হোসেনেব বহু সৈন্য নিহত হয়, ওহাব ও সখিনাব স্বামী কাসেমও প্রাণ হাবান। শেষে হোসেনও প্রাণত্যাগ কবেন। সে সব কাহিনী নানা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। কেবল হোসেনেব পুত্র জযলাল রক্ষা পান এবং মহম্মদ হানিফাব সাহায্যে মদিনার বাজা হন। কাববালাব পাশবিক অত্যাচাব-কাহিনী পাঠ কবিলে, এমন পাষাণ-হৃদয নাই, যাঁহাব অশ্রুপতন না হয়। হাসন-হোসেনেব কাহিনী ভক্তি বিশ্বাসেব অপূর্ব্ব ইতিহাস—অমৃত সমান, যিনি পাঠ কবিবেন, তিনিই মোহিত হইবেন, তিনিই হাহাকাব কবিবেন। এরূপ বিশ্বাসের জলন্ত দৃষ্টান্ত কোন ধর্ম্মেতিহাসে নাই। হাসনেব বিশ্বাসেব সহিত কেবল খ্রীষ্টেব বিশ্বাসেব তুলনা হইতে পাবে। সবল বাঙ্গালা ভাষায এই কাহিনী লিপিবদ্ধ কবিযা বেবতী বাবু যে পুণ্যেব কাজ কবিলেন, তাহা ভাষায ব্যক্ত হইবাব নয। তাঁহাব বহুকালব্যাপী সাধনাব চবম ফল এই পুণ্যময গ্রন্থ। এ পুস্তক বিশ্বাস ভক্তিব জীবন্ত দৃষ্টান্তে পূর্ণ। এমন মধুব ভাষায লিখিত যে, কোন উপন্যাসই ইহাব সহিত তুলিত হইতে পাবে না। আমবা সাহস কবিযা বলিতে পাবি, এই গ্রন্থ যিনি পডিবেন, তিনিই মোহিত হইবেন। ঘবে ঘবে এই পুস্তকেব আদব হউক। আপামব-সাধাবণে এই একখানি পুস্তক পাঠ কবিলে মুসলমানদেব জীবন্ত বিশ্বাসেব পবিচয় পাইযা ধন্য হইতে পাবিবেন। কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মেব ইতিহাস।

৫১। বনপ্রসূন। শ্রীভুবনমোহিনী দেবী প্রণীত, মূল্য ।৵০।

বঙ্গীয কবিতা-কাননে বর্ষণী-কোকিলেব কাকলী ও পঞ্চম ঝঙ্কার অতি মধুর, অতি মর্ম্মস্পর্শী। এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকেব স্থানে স্থানে কবিত্বেব বিশেষ চবিচয পাওয়া যায়। ভাষা ও ভাব বড়ই সরল ও মধুব। কবি 'প্রার্থনায' কলিয়াছেন—

আমি হর্ষ বিষাদে রহিব জড়িত
সংসার-মায়া-ভবনে;
রব আলোকে ও আঁধারে, আশা নিবাশায়

কভু হাসি কভু রোদনে।

আমরাও বলি, সংসারে-ক্ষেত্রে জীবন-সমস্যার ইহাই একমাত্র মীমাংসা।

৫২। উমা-আগমন। শ্রীভুবনমোহন সেন রচিত। ভাবতে ভাবতেশ্বরের ও ভাবতেশ্বরীর আগমন উপলক্ষে বিতরিত। ডিমাই ষোল পেজীর আট পৃষ্ঠার পুস্তিকার যেমন ভাষা, তেমনই ভাব।

৫৩। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে। কবি শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন প্রণীত, নব্যভারত-প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ১৲। কবি বলিয়াছেন, এই গাথাকাব্যের মূলবিষয় তাঁহার কিশোর বয়সে রচিত হইয়াছিল। পড়িলেও তাহাই মনে হয়। তথাপি নবীনচন্দ্রের শিষ্য সিন্ধুকবি শশাঙ্কের লেখনী অনেক স্থানে চিনিতে পারা যায়।

৫৪। The Devalaya—মাসিক কার্য্যবিবরণ, সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এম এ কর্ত্তৃক ইংরাজীতে লিখিত। দেবালয়ের সম্পাদক বলেন, "১৮৭৩ সনে শশিবাবু রবাহনগরে সাধারণ ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই দেবালয়ের বীজ।" তিনি এই সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন "We call it a unique movement, for we know of no previous attempt at the union which Babu Sasipada Banerjee endeavowred to bring about by this Sabha"

নানক চৈতন্যের কথা ছাড়িয়া দেই, মহাত্মা রামমোহন ও চিকাগো-সম্মিলনীকে পশ্চাতে ফেলিয়া শশিপদবাবুকেই ধর্ম্ম সমন্বয়ের উদ্ভাবক বলিয়া ঘোষণা করিলে কি সত্যের অপলাপ করা হয় না? সাধারণ ধর্ম্মসভা উঠিয়া গিয়া ১৮৭৬ সনে নাকি শশিপদ-ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯০৮ সনে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শশিপদবাবু আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি কর্ম্মী ও একজন প্রধান সমাজসংস্কারক। কর্ম্মময় ব্রাহ্মজীবনের পরিণতি কি বাঙময় ধর্ম্মসমন্বয়?

৫৫। দেবগণের ভারতভ্রমণ, শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ২৲। বিদ্যাসাগরের জীবনী-প্রণেতা চণ্ডীবাবু বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। লিখিবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ। সরল, প্রাঞ্জল, কথোপকথনের ভাষায় বহুজ্ঞাতব্য বিষয় এইগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। প্রতি পৃষ্ঠার প্রতি ছত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্য আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা 'দেবগণের ভারত ভ্রমণ' কি প্রণালীতে লিখিত, অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। তবে আলোচ্য গ্রন্থের ভাবের গভীরতা, বর্ণনার চাতুর্য্য, রচনার মাধুর্য্য, কটাক্ষের কুটিলতা, ও বিদ্রূপের তীব্রতা অতুলনীয়। বইখানি পড়িলে মনে হইবে যেন বাঙ্গালীর জীবনের একখানি আলোক-চিত্র চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। আমরা গ্রন্থকারের সহিত সকল বিষয়ে একমত হইতে না পারিলেও, সকলকেই এই পুস্তকখানি একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

৫৬। সীতা, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম্-এ, প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ (সংশোধিত)। পূর্ব্বে একবার নব্যভারতে এই পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণের চিত্র, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন চিত্রকর কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে অঙ্কিত চিত্র সংগ্রহ করিয়া একত্র সন্নিবেশ করিতে সীতা বহুরূপিণী হইয়াছেন।

৫৭। ভগবতী দেবী, শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত, মূল্য ৸০। বঙ্গগৌরব পুণ্যশ্লোক মহাত্মা বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবীর জীবন-চরিত। যে মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুসন্তান বাঙ্গালা দেশকে উপহার দিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহার পুণ্য জীবনী গৃহে গৃহে ভাগবতের ন্যায় আলোচিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের ভাষা ভাল। শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবুর বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত হইতে অনেক সাহায্য গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু পুস্তকে তাহা স্বীকৃত হয় নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবন-কথা।

তত্ত্বানুসন্ধান।

ব্লাভাস্কী-কৃত ক্রিয়ামূলে কোন্ তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, অথবা আদৌ উহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। অবশ্য কেহ কেহ ঐ সকল একেবারেই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। যাঁহারা অনুসন্ধান না করিয়া 'মিথ্যা'বাদ অবলম্বন করেন, বা প্রচার করেন, তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করা যায় না। যাঁহারা সংশয়ী, তাঁহারা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, কেন না, এই সকল অলৌকিক ব্যাপারে প্রথমতঃ সংশয় হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বোধ হয়, অনভিজ্ঞগণের অধিকাংশই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু সংশয়ীগণ অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত আছে, যুক্তিতর্ক বা পরীক্ষিত ঘটনাদি শুনিতে তাহাদের কোন আপত্তি নাই। অন্ততঃ তাহাদের মানসিক অবস্থা অনুসন্ধানের বিরোধী নহে, শ্রবণ মননের প্রতিকূল নহে। কিন্তু যাহারা বিনা অনুসন্ধানে 'মিথ্যা' সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, তাহারা বোধ হয় অনুসন্ধানের কোন আবশ্যকতাও স্বীকার করে না। সুতরাং ইহাদের মানসিক অবস্থা অনুসন্ধান, বা শ্রবণ মননের অনুকূল নহে। আর ইঁহাদের সিদ্ধান্ত যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই 'মিথ্যা'বাদী অপেক্ষা সংশয়বাদী এই অংশে অনেক শ্রেষ্ঠ। সংশয়বাদী অধিকতর চিন্তাপ্রবণ এবং সত্যানুসন্ধিৎসু।

'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' একথা স্থল-বিশেষে ও অবস্থা-বিশেষে প্রযুজ্য। সংশয়াত্মা বিনষ্ট হইলে মূঢ়চেতা মিথ্যা জ্ঞানিগণের অবস্থা আরও কত শোচনীয়। যাঁহারা বিশ্বাসের পথ পাইয়াছেন, আত্ম-প্রত্যয়ের আকর লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে ইহপরকালের দৃষ্টিবোধক বিঘ্ন সমুদয় অপসৃত হইয়াছে। তাঁহারা দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের তুলনায় সংশয়াত্মা অবশ্যই বিনাশের গর্ত্তে পতিত। যে পর্য্যন্ত সংশয়ের আবরণ ভেদ করিয়া দিব্যলোক আবির্ভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত সংশয়াত্মার অবস্থা অন্ধ তমসাবৃত কীটের ন্যায় প্রতিক্ষণেই মৃত্যু-আশঙ্কাজড়িত। সংশয় অপেক্ষা অন্ধ বিশ্বাস ভাল, একথা সর্ব্বত্র সমীচীন নহে। যদি সৌভাগ্য ক্রমে অন্ধ-বিশ্বাস সৎকার্য্যের দিকে প্রবর্ত্তিত হয়, তবেই মঙ্গল। কিন্তু অন্ধ-বিশ্বাস সৎ অসৎ উভয় দিকেই ধাবিত হইতে পারে, কেন না উহা অন্ধ। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই অন্ধ বিশ্বাস অসৎ কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে, জগতে জ্ঞানালোক বিস্তারের প্রতিবন্ধক হইলে, উহা কখনই শুভফলোপধায়ক হইতে পারে না, অধিকন্তু অনেক অনিষ্টের উৎপাদক হইতে পারে। 'গোঁড়ামী'-দৈত্য ধর্ম্মরাজ্যকে কতবার কত প্রকারে লণ্ড ভণ্ড করিয়াছে, তাহা কে না জানে? সংশয়ী দ্বারা সেরূপ অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা নাই। এ জন্যও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিথ্যা জ্ঞানী অপেক্ষা সংশয়ী অধিকতর আদরণীয়। বিনা অনুসন্ধানে যে ব্যক্তি 'মিথ্যা'বাদ প্রচার করে, তদপেক্ষা

অধিকতর কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর কেহ আছে কি?

যাহারা সত্যকামী সংশয়ী, তাহারা তর্ক-যুক্তি অনুসন্ধান দ্বারা সংশয় অপনোদন করিয়া সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ",—একথা বলিয়া তাহাদিগকে নিবোধ করা উচিত নহে। এই শাস্ত্র-বাক্য অতীব সত্য বটে, কিন্তু ইহারও প্রযোগস্থল চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। 'অচিন্ত্য' পদ-দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে না কি যে যাহা 'চিন্ত্য'-চিন্তাযোগ্য-চিন্তনীয়,তাহা যুক্তিসাহায্যে বুঝিতে অগ্রসর হওয়া উচিত। কেন না, 'অচিন্ত্যে' মানব মনের যে বাধা আছে, 'চিন্ত্যে' তাহার অভাব। কিন্তু চিন্ত্য অচিন্ত্য উভয়ের প্রতিই অনেকে এই শাস্ত্র-বাক্য প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার পথে বিরাগ জন্মাইতে প্রয়াস পান। ইহা কতকটা দুর্ব্বলচিত্ততার লক্ষণ,—পাছে যুক্তির আঘাতে আজন্মপোষিত পূর্ব্বোক্তরূপ অন্ধ-বিশ্বাস স্থানচ্যুত হইয়া যায়, বোধ হয়, এইরূপ একটা ভয় উহার মূল কারণ। কিন্তু যে বিশ্বাসের ভিত্তি এত দুর্ব্বল, তাহা আত্ম-প্রত্যয় হইতে কত দূরে!

যাহা অচিন্ত্য বলিয়া অবধারিত, তাহার প্রতিও মানুষ এক অচিন্ত্য প্রভাবে আকৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম-তত্ত্ব বদ্ধজীবের অচিন্ত্য। "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন মনো ন বাক্", সেখানে বাক্য মন ইন্দ্রিয় কিছুই পহুঁছিতে পারে না। তথাপি আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা বশে মানুষ ভগবত্তত্ত্বের দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। তারপর কোন একটী বিষয় আগাগোড়াই অচিন্তনীয় কি না, তাহাও বিবেচ্য। বিষয় বিশেষের অবস্থা বিশেষ অচিন্ত্য হইয়া পড়ে, সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার ইতর অবস্থা সকল চিন্তাযোগ্য হইতে পারে। জগতে সুখ দুঃখের তারতম্যের কারণানুসন্ধানে ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নিদর্শনে দর্শন-শাস্ত্রে যে সকল তর্কযুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা চিন্তাতীত নহে। চিন্তাতীত হইলে উহাদের প্রকটন অসম্ভব হইয়া পড়িত, এবং উহাদের কোন সফলতা বা আবশ্যকতাও থাকিত না। কে বলিবে, দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা নিষ্ফল ও অনাবশ্যক? কিন্তু ঐ সকল যুক্তিতর্কের অনুসরণ করিতে করিতে এমন এক স্থলে আসিয়া আমরা উপনীত হই, যেখানে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে, বাসনা আগে কি কর্ম্ম আগে, সংস্কার আগে কি সংসার আগে,—তাহার মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই, বৈদান্তিক অদ্বৈতমতাশ্রিত মায়া-বাদের শেষ কেনটারও কোন উত্তর নাই। উহা অচিন্ত্যভাবময়। জীবে ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। আমি সেই ব্রহ্ম। প্রশ্ন এই—সর্ব্বচৈতন্যময় ব্রহ্মে বা আমাতে এ দ্বৈত-ভ্রান্তি কোথা হইতে আসিল? মায়াবাদী বলিতেছেন, কোথা হইতে আসিবে? ইহা যে মায়া,—মায়া অনাদি, সংস্কার অনাদি, সংসার অনাদি, সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি-দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।"* সংসার অনাদি না হইলে উহার অকস্মাৎ উৎপত্তি প্রভৃতি নানা দোষ ঘটে, কারণ বিনা কার্য্য কোথায়? সৃষ্টি অকস্মাৎ উদ্ভূত (Result of chance) হইলে কখনই

* "উপপদ্যতেচ সংসারস্য অনাদিত্বং, আদিমত্বে হি সংসারস্য অকস্মাদ্ভূতে মুক্তানামপি পুনঃসংসারোদ্ভূতি প্রসঙ্গ অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গশ্চ সুখদুঃখাদি বৈষম্যস্য নির্নিমিত্তত্বাৎ।"—শাঙ্করভাষ্য।

ইহাতে এরূপ কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা থাকিত না। এইরূপ যে সকল যুক্তি দ্বারা বেদান্তাচার্য্যগণ সংসারের অনাদিত্ব স্থাপনা করিয়াছেন, তাহা একরূপ অকাট্য, এবং একটী জটিল তত্ত্বের প্রবেশ পথে সুস্পষ্ট সঙ্কেত চিহ্ন স্বরূপ, সন্দেহ নাই। সংসার ও সংস্কার সমকালব্যাপী, সুতরাং সংস্কারও অনাদি। যুক্তি মুখে এই পর্য্যন্ত স্থাপিত ও স্বীকৃত হইলেও মূল প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। সৎস্বরূপের অনাদি বাসনা জালে, ভ্রান্তি-মোহে আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা,—ব্রহ্মের এ বিড়ম্বনা, কিরূপে এবং কেন হইল? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। বিশিষ্টাদ্বৈতের আচার্য্য ত স্পষ্টতঃই তৎকৃত ব্যাখাত ভেদাভেদবাদকে 'অচিন্ত্য' আখ্যা দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। উহার নাম 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ।' সবিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বও সাধারণ মনবুদ্ধির অগোচর, অজ্ঞেয়। তবে উহা সাধারণ বুদ্ধির অজ্ঞেয় (unknowable) হইলেও সংবাধন অর্থাৎ ভক্তিপ্রণিধানাদি উপায়ে সাক্ষাৎকারযোগ্য (Realizable) হইতে পারে *। কিন্তু যাহা কোন বিশেষণে বিশিষ্ট নহে, কোন লক্ষণে লক্ষিত নহে, এরূপ যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-তত্ত্ব, তাহা চিন্তা বা মনের অধিগম্য হইতে পারে না। কারণ মানসিক অনুভূতির যাহা উপাদান,—অর্থাৎ পদার্থের মধ্যে সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বোধ (power discrimination and power detecting identity)—তাহা পরিচ্ছন্ন বা বিশিষ্ট বিষয়ের বহির্ভূত হইতে পারে না। উপায় বিশেষ অবলম্বনে জীবাত্মা নির্ব্বিশেষ অবস্থা লাভ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তখন সে নিজেই নিজের অজ্ঞেয়, কারণ সে অবস্থায় কে কাহাকে জানিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে? নির্ব্বিশেষ সত্তাকে তর্কযুক্তির দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই, বুঝাইবার উপায় নাই। উহা তর্কের ভিতর আনয়ন করিলে, তর্কের পরিবর্ত্তে বাদ, বিতণ্ডা, জল্প প্রভৃতির উৎপত্তি হইবে। তদ্দ্বারা সত্য নির্দ্ধারিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। চিন্তার স্তর (stage of ratiocination) অতিক্রম পূর্ব্বক আত্মিক-ভূমিতে পঁহুছিতে পারিলে একমাত্র প্রজ্ঞান সাহায্যে এ সকল সংশয় ছিন্ন হইতে পারে। অনির্ব্বাচ্য বলিয়া ইহাতে তর্ক-নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ সকল বিষয়ের উপরোক্ত আনুষঙ্গিক অবস্থা-ঘটিত প্রশ্ন সমূহে তর্ক নিষিদ্ধ হয় নাই। বরং তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে 'চুল-চেরা' তর্ক বিতর্ক বিন্যস্ত রহিয়াছে। এরূপ না হইলে জ্ঞানের দ্বার একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু অনেকে স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিষয় মাত্রকেই অনুসন্ধানের অযোগ্য ও অচিন্ত্য বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। এটী ভুল। অতএব আমরা সকল সংশয়বাদীকে অনুসন্ধানার্থ আহ্বান করিতেছি।

গীতায় অর্জ্জুন ভগবানকে বলিতেছেন,—

'এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ'।

ইত্যাদি। অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় তুমি সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দাও। এক স্থলে নহে, সর্ব্বত্রই তত্ত্বলিপ্সু অর্জ্জুনের এই ভাব। সমগ্র গীতা এইরূপ সংশয়াকুলিত প্রশ্নাবলীর সমাধান।

মাদাম ব্লাভাস্কীর অনুষ্ঠিত অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ আমরা অলৌকিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ও অসাধ্য বলিয়াই সচরাচর ঐসকল ক্রিয়াকে 'অলৌকিক' আখ্যা প্রদত্ত হয়। কিন্তু উহা কিছুমাত্র

* "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।—ব্রহ্মসূত্র।

* "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ।"—উপনিষৎ।

লোকাতীত নহে। এ গুলিকে কেহ অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বলিলে তিনি স্বয়ং ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন যে, এ সকল সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। সেই সব প্রাকৃতিক নিয়ম এক্ষণও অনাবিষ্কৃত,—স্থূল বৈজ্ঞানিকের অগোচর। কিন্তু এক যুগের যাহা অসম্ভব অতিপ্রাকৃতিক, তাহাই যুগান্তরে প্রামাণিক সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। বাষ্পতাড়িত অদ্ভুত শক্তির আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে কে বিশ্বাস করিত যে, উহা কখনও ভৃত্যের ন্যায় মানুষের সেবায় প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহাই আজ হইতেছে না কি? ভাবহীন বিদ্যুৎ-বার্ত্তার কথা কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল কি? কিছু দিন পূর্ব্বে ইহার প্রচলন-প্রস্তাব লোকে উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া মনে করিত। কিন্তু আজ উহা পরীক্ষিত সত্য। জড় বিজ্ঞান যেরূপ বেগে উন্নতি মার্গে আরোহণ করিতেছে, তাহাতে বোধ হয় কালে উহা নৈসর্গিক সূক্ষ্মতর শক্তি সমূহের কথঞ্চিৎ আভাষ পরিচয় লাভে সমর্থ হইবে। তখন যে, অদ্যকার তথা-কথিত অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক ক্রিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রাকৃতিক বলিয়া বিবেচিত হইবে, ক্রমে যে সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হইবে,—ইহা আশা করা অন্যায় নহে।

কতিপয় বৎসর যাবৎ জগতের শীর্ষস্থানীয় জড়বৈজ্ঞানিকগণ মনস্তত্ত্বের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাও নব বৈজ্ঞানিক যুগের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। তবে অদ্যাপি তাঁহারা এ বিষয়ে ভারতীয় তথা প্রাচ্য ঋষিকুল হইতে কল্পনাতীত দূরে অবস্থিত। ঋষিগণ নৈসর্গিক শক্তি-পুঞ্জের মিলন বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং উহাদের প্রয়োগ পরিচালন তাঁহাদের নিকট ক্রীড়ার ন্যায় সহজ-সাধ্য ছিল। অদ্যাপি যোগসিদ্ধ ব্যক্তিরা, এমন কি, নিম্ন শ্রেণীর যোগীরাও সংকল্প প্রভাবে জড়শক্তি লইয়া যদৃচ্ছা কার্য্য করিতে সমর্থ। একথায় যাহারা সন্দিহান, তাঁহারা মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবন পর্য্যালোচনা করুন, তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়াবলীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। তিনি স্বয়ং একজন সিদ্ধ মহাত্মা না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ক্রিয়াতে উল্লিখিত উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সকল অনৈতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক কালের, বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের, অলস কল্পনা-বিজৃম্ভিত অলীক গল্প উপন্যাস নহে,—কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রোজ্জ্বল সভ্যতালোকে সর্ব্বজন সমক্ষে অনুষ্ঠিত প্রকৃত ঘটনা।

ব্লাভাস্কীর প্রতি যাহাদের সন্দেহ, তাঁহারা একবার পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণের সাক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সার উইলিয়ম ক্রুকস (Sir William Crooks)-প্রমুখ বিজ্ঞানরথী-গণের প্রবর্ত্তিত সাইকিকেল সিরার্চ্চ সোসাইটী (Psychical Research Society) হইতে প্রকাশিত বিবরণাবলী (Reports) মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। ইঁহাদের জড় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সকল সমগ্র সভ্য জগৎ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া থাকে। চৈতন্যশক্তির অসীম প্রভাব-মূলক সম্মোহন-বিদ্যা (mesmerism, hypnotism), চিন্তা-প্রেরণ (thought-transference,) পরচিত্ত-জ্ঞান (thought-reading,) দূরস্থ ব্যক্তিগণের পরস্পরের ভাবানুভূতি (Telipathy), প্রভৃতি বিষয় সংসৃষ্ট, সত্য, কঠোর বিজ্ঞান-পরীক্ষিত ভূরি ভূরি ঘটনার বিবরণ পাঠান্তে, ব্লাভাস্কী স্বয়ং যতই অবিশ্বাস-যোগ্য হউন, তদনুষ্ঠিত ক্রিয়া সকল যে একেবারে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন অপ্রাকৃতিক, বোধ হয়, ইহা বলিতে

কেহই সাহসী হইবেন না। এই পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও, অদ্যাপি প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর অভ্যন্তর-প্রবেশ-দ্বার মাত্র লাভ করিবার জন্য ইতস্ততঃ হস্ত সঞ্চালন করিতেছেন বটে, কিন্তু ইঁহারা যে রহস্য-মন্দিরের বহির্বাঙ্গনের অন্ততঃ নিম্নতম সোপানেও পদার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং ইহাই আশাজনক। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহারা ব্লাভাস্কীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহাদেরই উক্তিতে, কার্য্যে, সাক্ষ্যে তদনুষ্ঠিত ক্রিয়াসমূহের সমধিক সমর্থন হইতেছে!

যাহা হউক, এক্ষণ আমরা ব্লাভাস্কীর-কৃত ক্রিয়াকলাপের প্রকার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। তাঁহার ক্রিয়া সকল কোন শক্তির ভিন্নতানুসারে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে।*

(১) তাঁহার স্বীয় সংকল্প-শক্তি-জাত ক্রিয়া।

(২) ভূত-যোনী সাহায্যে কৃত ক্রিয়া।

(৩) সম্মোহন-বিদ্যা-জনিত ক্রিয়া।

(৪) মহাপুরুষগণের সাহায্যে বা সাহচর্য্যে কৃত ক্রিয়া।

(৫) দূর বা দিব্য দৃষ্টি, দূর বা দিব্য শ্রুতি, এবং পরচিত্তজ্ঞান প্রভৃতি উপায়ে কৃত ক্রিয়া।

(৬) সূক্ষ্ম নৈসর্গিক শক্তি সমূহের (Finer forces of nature) সংশ্লেষ ও প্রয়োগ পরিচালন শক্তি সাহায্যে কৃত ক্রিয়া।

(৭) আধ্যাত্মিক জ্ঞান-দৃষ্টি, যোগজ বা সমাধিজ বা প্রতিভা প্রভাবে কৃত ক্রিয়া।

এই সকল উপায় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম স্বকীয়, দ্বিতীয় পরকীয়। তাঁহার সংকল্পশক্তি, দিব্য-দৃষ্টি, যোগজ ঐশ্বর্য্য,—এগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। আর ভূত-যোনী বা মহাপুরুষগণের সাহায্য পরকীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাও যে গৌণভাবে তাঁহার স্বকীয় শক্তিরই প্রভাব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, ভূতযোনীকে স্বীয় আয়ত্বাধীনে আনিয়া কার্য্য করাইয়া লওয়া শক্তি ও সাধন সাপেক্ষ, অন্যথা সাধ্য নহে। ভূত-যোনীর কথায় যেন কেহ এরূপ মনে না করেন যে, ব্লাভাস্কী ভূতাবিষ্ট হইয়া বা প্রেত-বাহিত হইয়া কোন অদ্ভুত কার্য্য দেখাইতেন। আমরা উপরে যে ভূত-যোনী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে প্রেতের কোন সম্পর্ক নাই। প্রেত কর্ত্তৃক আবিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, তিনি প্রেতের সহিত কোন সংশ্রব রাখিতেন না। মরণান্তর অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত জীবকে প্রেত বলা গিয়া থাকে। আর সূক্ষ্ম-জাগতিক তন্মাত্রা-গঠিত এক শ্রেণীর জীব বিশেষকে ভূত-যোনী (Elementals) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক গুণানুসারে ইহাদের মধ্যেও উচ্চাবচ অবস্থা আছে। প্রেতাবস্থা সম্বন্ধে ব্লাভাস্কীর ধারণাও প্রেততাত্ত্বিকগণের মতের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে,—ইহা আমরা অতঃপর বর্ণন করিব। যে ব্যক্তি পরলোক-বাসী কর্ত্তৃক আবিষ্ট বা চালিত হইয়া সজ্ঞানে তাহাদের কথা বা ভাব লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন, প্রেততাত্ত্বিকেরা তাহাকে উত্তম 'লেখক' 'মাধ্যমিক' (writing medium) বলিয়া থাকেন। ব্লাভাস্কী উত্তম শ্রেণীর মাধ্যমিক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রেত-চালিত হইয়া কখনও ঐ রূপ মাধ্যমিকের অবস্থা অঙ্গীকার করেন নাই। বিশেষতঃ সাধারণ জন-সমাজ পাছে তাঁহার ক্রিয়া যাথার্থ্যে কোন অথবা

*Vide 'Old Diary Leaves'—First Series,—by Col. Olcott

সন্দেহের অবসর পায়, এইজন্য তিনি কখনও স্বহস্তে তিনি কিছু লিখিতেন না। ব্লাভাস্কীর আধ্যাত্মিকী শক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল, কিন্তু উহা অতীব উচ্চ অঙ্গের। প্রেতাবেশ সীমা হইতে উহা বহুদূর অবস্থিত। সাধন-নির্ম্মল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, অপর দেবতা বা শক্তির কথা দূরে থাকুক, ভগবৎ-শক্তিরও আবেশ, আবির্ভাব বা অবতরণ হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনী সংক্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি কি প্রকারে কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতির ভাবে আবিষ্ট হইয়া তত্তৎ লীলানুকরণে প্রবৃত্ত হইতেন। আবেশ তত্ত্বটী সমধিক পরিস্ফুট দেখা যায়। স্বরূপাবেশ ও শক্ত্যাবেশ ভেদে আবেশ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। যখন আবেশকারী স্বয়ং সূক্ষ্মাকারে আবিষ্টের দেহ অধিকার পূর্ব্বক তাহাকে পরিচালিত করেন, তখন উহা স্বরূপাবেশ। আর যখন আবেশকারী স্বীয় প্রেরণা বা সংকল্প শক্তি দ্বারা আবিষ্টকে অনুপ্রাণিত ও চালিত করেন, তখন উহা শক্ত্যাবেশ। এতদবস্থায় আবিষ্ট ব্যক্তি আবেশকাল পর্য্যন্ত স্বীয় শক্তির বহির্ভূত ও স্বীয় জ্ঞানের অতিরিক্ত অসাধারণ জ্ঞান, শক্তি ও গুণের আধার স্বরূপ হইয়া পড়ে। দৈবী সম্পৎ-সম্পন্ন মধ্যাত্মনিষ্ঠ জীবের দেহে সময়ে সময়ে মহাপুরুষেরা স্বয়ং সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত, বা শক্তি যোগে আবিষ্ট হইয়া জগতের অনেক হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ উভয়বিধ আবেশে, এবং মহাত্মাগণের সাহায্যে ও সাহচর্য্যে ব্লাভাকী-কৃত 'তত্ত্ব-প্রকাশিকা' (Isis unveiled), এবং গূঢ় রহস্যতত্ত্ব (Secret Doctrine) নামক মহাগ্রন্থদ্বয় লিখিত হইয়াছে। ভূত-যোনী সাহায্যে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন করা যেমন গৌণভাবে তাঁহার স্বকীয় শক্তির অন্তর্গত, মহাপুরুষগণের সাহচর্য্য বা সাহায্য লাভও তদ্রূপ তাঁহার সাধন-নিষ্ঠার ফল। কেন না, তাঁহারা কখনও অপাত্রে বা ধারণাক্ষম অনধিকারী জীবে শক্তি সঞ্চার করেন না।

যাহা হউক, ব্লাভাস্কী কোন্ উপায়ে কোন্ ক্রিয়াটী সম্পন্ন করিতেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, কেননা উপরোক্ত উপায়গুলির যে কোন একটী দ্বারা তিনি কার্য্য করিতে পারিতেন। তবে ক্রিয়া দেখিয়া উহার কতকটা দিক্ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কারণ, ক্রিয়ার গুরুত্বের অনুপাতে, অবশ্যই উপায়ের তারতম্য হইত। তা ছাড়া দুই এক স্থলে তিনি নিজে অবলম্বিত উপায় সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও কতক জানা যাইতে পারে।

টিফ্লিস্ নগরে শতরঞ্জ-টেবিল-ঘটিত যে ব্যাপারটী পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মূলে যে ব্লাভাস্কীর একমাত্র সংকল্প-প্রভাব বর্ত্তমান, ইহাতে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। সচরাচর এরূপ শক্তি প্রয়োগ দেখা যায় নাই। শব্দ-সাহায্যে কোন বিষয় জানিবার কথা উঠিলে, তিনি কখনও কখনও পূর্ব্বেই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহা এই,—'তোমরা কি চাও?" ভূতোৎপাদিত শব্দ চাও, কি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞ মদীয় কোন সহকারী কর্ত্তৃক পরিচালিত শব্দ চাও? কথাটী স্পষ্টতর করণার্থ শ্রীযুক্ত সিনেট মহোদয় এতৎ সম্বন্ধে ব্লাভাস্কীর কৃত ব্যাখ্যার যে মর্ম্মোদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই—

"বাল্যাবধি প্রায় পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার অবস্থা যে ভূতাবেশের অতীব অনুকূল ছিল, তাহা তিনি নিজেও গোপন করিতেন না। কিন্তু তদনন্তর রীতিমত আধ্যাত্মিক

ও দৈহিক সাধন প্রণালীর অবলম্বন ও অনুষ্ঠান ফলে তাঁহার সে আপদ-সঙ্কুল অবস্থা একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন আর তাঁহার স্বীয় শক্তির বহির্ভূত ও স্বীয় ইচ্ছার অনধীন কোন বাহ্য শক্তি দ্বারা অভিভূত হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। সাধন প্রভাবে তখন তিনি এরূপ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, বাহ্য শক্তিকে স্বীয় শাসনাধীনে রাখিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালনা করিতে পারিতেন। শব্দ দ্বারা কোন তথ্য প্রকাশ করিতে হইলে তিনি আপন আয়ত্তাধীন দুই প্রকারের দুইটী উপায়ের একতর অবলম্বন করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিতেন। এক উপায়ে তাঁহাকে স্বয়ং কিছুই করিতে হইত না। তিনি নিজে এক প্রকার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিয়া সূক্ষ্ম শরীরী ভূত সমূহকে কার্য্য করিতে অনুমতি দিতেন। মানবের চিন্তা বহুরূপী গিরগিটীর ন্যায় নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। ভূতগণ সূক্ষ্ম জগতস্থ সেই বৈচিত্র্যময় চিন্তারাশির প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে থাকিত, এবং তৎসম্পর্কে ব্লাভাস্কীর মনোগত ভাব বা অনুজ্ঞা অবগত হইয়া আপনারাই তদনুযায়ী কার্য্য করিত। অপর উপায়টী তিনি কদাচিৎ অবলম্বন করিতেন, কারণ ইহার সহিত পরলোকগত জীবাত্মার কিঞ্চিৎ সংশ্রব আছে। লোকান্তরিত জীবকে লইয়া টানাটানি করা, ও তাহার 'চিন্তাস্রোতে' দৃষ্টি নিক্ষেপ বা বিক্ষেপ উৎপাদন করা ব্লাভাস্কীর মত বিরুদ্ধ ছিল। সুতরাং এই উপায় সচরাচর অবলম্বন করিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। ইহার প্রণালী এইরূপ। তিনি নিমীলিত নেত্রে ধ্যানাবস্থোচিত প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম জগদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেন, এবং তথায় কোন পরলোক-প্রাপ্ত ব্যক্তির চিন্তা-প্রবাহ আবিষ্কার করিয়া নিজ চিত্তকে কিয়ৎ ক্ষণের জন্য সেই চিন্তাকারে আকারিত করিয়া ফেলিতেন। তার পর স্বীয় মানসপটস্থ সেই চিন্তা-চিত্রটী, সংকল্প শক্তি দ্বারা শব্দ উৎপাদন পূর্ব্বক, সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশিত করিতেন। মনে করুন, শব্দ বিশেষ শ্রবণ করিয়া সকলের ধারণা হইল যে, কবিবর সেক্ষপীর (Shakespaere) আসিয়া শব্দ করিতেছেন। তাহা হইলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, স্বয়ং কবিবরের আত্মা তথায় আগমন করিয়াছেন। শব্দ গুলি তাঁহার জীবিত কালীন মানসজাত চিন্তারাশির প্রতিধ্বনি মাত্র। মানুষের চিন্তা অক্ষয়, অবিনাশী, চিন্তার ধ্বংস হয় না। উহা এক প্রকার মূর্ত্ত্য ভাব ধারণ করিয়া সূক্ষ্ম আকাশে চিরকাল বিদ্যমান থাকে। সেক্ষপীর বহুকাল কামলোকাখ্য সূক্ষ্ম জগত অতিক্রম করিয়া লোকান্তরে গিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি ইহজন্মে যাহা যখন ভাবিয়াছিলেন, তাহা চিত্তে উদয় হইবা মাত্র আকাশে অঙ্কিত হইয়াছে ও চিরকাল থাকিবে। ব্লাভাস্কী মানবের ঈদৃশ চিন্তা-লেখা প্রকৃতির সেই গ্রন্থ হইতে স্বীয় জ্ঞানোদ্ভাসিত দৃষ্টি সাহায্যে পাঠ করিয়া চিত্ত-পটে উহার অবিকল অনুলিপি গ্রহণ করিতেন। এই প্রণালীর অন্তর্গত শব্দ প্রকাশিত যাবতীয় তথ্যই তিনি প্রথমতঃ মনোমধ্যে গঠিত করিয়া লইতেন। মৃত ব্যক্তির জীবিত কালীন তদীয় স্থূল মস্তিষ্কজাত ভাববিকার,—যাহা আকাশের গুপ্ত ভাণ্ডারে চিরসংরক্ষিত হইয়া আছে,—ব্লাভাস্কী অধ্যাত্ম দৃষ্টিযোগে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন, দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আবার ফটোগ্রাফ বা আলোক চিত্রের ন্যায় উহার

প্রতিবিম্ব আপন স্থূল মস্তিষ্কে গ্রহণ করিতেন। তৎপর ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে উৎপন্ন শব্দ পথে সেই চিন্তাটী বাহ্যাকারে প্রকাশিত ও সাধারণের বোধগম্য করিয়া দিতেন। ইহাই তাঁহার গুপ্ত তথ্য লাভের অন্যতম উপায়।

উল্লিখিত উক্তি অনুসারে এই দ্বিতীয় প্রণালীটী স্পষ্টতঃই পূর্ব্ববর্ণিত উপায়গুলির সপ্তম শ্রেণীভুক্ত। এই উপায় অবলম্বনে তিনি হ্যান্ বংশীয় বিলুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার করিয়াছিলেন। এবং পরবর্ত্তীকালেও নানা স্থানে ও নানা গ্রন্থে, অজ্ঞাত ও লৌকিক উপায়ে অপ্রাপ্তব্য অধ্যাত্ম ও পারলৌকিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত রাশিং তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলে, এবং তদপেক্ষা অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের সাহায্যে যে সকল তথ্য প্রকাশ করিতেন, তাহাতে ভ্রান্তির লেশ মাত্র থাকিত না, উহা বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। সংযম প্রভাবে, মানুষের জ্ঞানদৃষ্টি কতদূর প্রসারিত হইতে পারে, এবং মানব কিরূপ অভাবনীয় ক্ষমার অধিকারী হইতে পারে, তাহা যোগদর্শনের বিভূতি পাদোক্ত সূত্রগুলিতে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। এই সংযম শক্তির পরিপাকাবস্থায় তাহার এক প্রকার প্রতিভা লাভ হয়। দর্শনকার শেষে এতদূর বলিয়াছেন যে, "প্রাতিভাৎ বা সর্ব্বং",—অর্থাৎ প্রতিভা-জ্ঞানের দ্বারা মানুষ সবই জানিতে পারে।

হত্যাঘটিত যে ব্যাপারটী ব্লাভাট্স্কী আমূল প্রকাশিত করিয়া রুষীয় পুলিশ বিভাগকে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, উহা পঞ্চম পর্য্যায়োক্ত উপায়ের অন্তর্গত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, পুলিশ কর্ম্মচারী গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র হত্যাকাণ্ড-ঘটিত যাবতীয় ব্যাপার যেন আপন চক্ষুর সম্মুখে চিত্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। হত্যাকারীও তাহার সহযোগীগণের নামধামাদি সমস্তই সেই চিত্রে আরূঢ় রহিয়াছে। তৎপর তিনি যথোচিত উপায়ে শব্দোৎপাদন করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিলেন। ইহাতে ভৌতিক সংশ্রব কিছু মাত্র ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীতোৎপত্তি ব্যাপার কোন্ উপায়ে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই। উহা তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, বা কোন সূক্ষ্ম শরীরীর সাহায্যে-কৃত হওয়া সম্ভব। ভূতযোনীর মধ্যে উত্তমাধম-শ্রেণী বিভাগ আছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার ভগ্নী লিখিয়াছেন,— নিম্ন শ্রেণীর দ্বারাই সাধারণ্যে প্রকাশিত অধিক সংখ্যক অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। যাহারা উচ্চতম শ্রেণীভুক্ত, তাহারা অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে কোন অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতে প্রায় সম্মত হইত না। ইহাদের আবির্ভাব হইত তখন, ইহাদের আত্ম-প্রকাশ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সম্পূর্ণ যোগ্য হইত তখন, যখন আমরা একাকী থাকিতাম, যখন গৃহে শান্তি, নীরবতা ও একপ্রাণতা পূর্ণরূপে বিরাজ করিত।"

তৃতীয় পর্য্যায়োক্ত সম্মোহন-বিদ্যা প্রভাবে কৃত কার্য্যগুলি মায়িক (hypnotic illusion) যেখানে যাহা নাই, সেখানে তদ্বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করা প্রভৃতি কার্য্য ইহা দ্বারা হইতে পারে। যেমন স্থলে জল জ্ঞান, অথাদ্যে খাদ্য জ্ঞান, আকাশপুরী দর্শন ইত্যাদি। এ সকল ক্রিয়া আজকাল অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, এবং বোধ হয় প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমরা ব্লাভাট্স্কী জীবনের যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখনও ইহা তত প্রচলিত হয় নাই।

এই জীবনীতে অতঃপর আমরা ইহার এবং পরচিত্ত-জ্ঞানাদি বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব।*

ব্লাভাস্কী কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, ইহা সম্যক্ রূপে বলা যে সহজ নহে, তাহা কর্ণেল অলকট্ মহোদয় স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যথার্থই বলিয়াছেন :—

"I do not pretend to be able to explain the rationale of all H P, B's phenomena, for to do that one would need to be as well informed as herself, which I never pretended to be"

—অর্থাৎ, ব্লাভাস্কীর অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের কারণ-তত্ত্ব সঠিক বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। একথা খুব সত্য। বস্তুতঃ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-পারদর্শী ও যোগদৃষ্টি-সম্পন্ন না হইলে তদ্রূপ অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু অনুসন্ধান-বিমুখতা চিরদিনই সত্য লাভের পরিপন্থী। † পূর্ব্ব সুধিগণের নির্দ্দিষ্ট পন্থায়, তাঁহাদের প্রকাশিত যুগো-দর্শন সূত্র সকল অবলম্বন পূর্ব্বক এ তত্ত্বের অনুধাবন করিলে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। জড়-তত্ত্বের ন্যায় জড়াতীত তত্ত্বও যে সন্ধান-যোগ্য, অনন্ত রত্ন-রাজির আকর, তাহা কে অস্বীকার করিবে? উভয়কেই পরস্পর সহযোগিতায় বিজ্ঞান-সম্মত উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা হইলেই একের আবিষ্কৃত সত্যে অপরের অভাব ও সমস্যা পূরণ হইতে পারে। সেই জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অধুনা এত আগ্রহের সহিত জড়াতীত তত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ব্লাভাস্কী এই অনুসন্ধান-মার্গ নানা উপায়ে সুগম ও প্রশস্ত করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

---

* এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা সেদিনও একজন পাশ্চাত্য লেখক তদ্দেশীয় বিজ্ঞান-বিশারদ সুধীমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :—"Telepathy is now as much an established fact amongst psychologists as the law of gravitation amongst physical scientists."—Mr. R. H. Benson in Doublin Review.

বলা বাহুল্য, পরচিত্তজ্ঞান, চিন্তা প্রেরণ প্রভৃতি বিষয়ও ইহা দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

† আমাদের দেশে বিধিমত অনুসন্ধানের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। একমাত্র স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত Hindu Spiritual Magazine নামক মাসিক পত্র ছাড়া অন্যত্র অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আলোচনা দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু উক্ত পত্রিকায় প্রধান আলোচ্য বিষয়, প্রেততত্ত্ব ও পারলৌকিক বিজ্ঞান। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অপরাপর বিভাগেও এইরূপ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা কোথায়? অথচ এ দেশে জড়বাদের অভাব নাই। যদি ভারতীয় মনীষীগণ এ দেশে বিলাতের Psychical Research Society'র ন্যায় একটী সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অনুশীলন করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন, বিলাতে এতত্ত্ব নূতন বলিয়া তথাকার মনস্বীগণ উহার দিকে এত আকৃষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে তাহা নূতন নহে। এ কথা স্বীকার করিলেও ইহা স্বীকার্য্য যে, আমরা এমনই আত্মহারা হইয়াছি যে, অতীন্দ্রিতত্ত্বের প্রমাণের জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্যদের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। এবং এদেশে পূর্ব্বের ধর্ম্মভাব যে অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই সেই ধর্ম্ম ভাবটী রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তনার প্রয়াসী হইয়াছেন। এ উদ্দেশে মহৎ, এবং চেষ্টা সময়োচিত। বোধ হয়, উক্তরূপ একটী সমিতি স্থাপিত হইলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে আরও সহায়তা হয়। প্রখ্যাতনামা সার ওলিভার লজের (Sir Oliver Lodge) ন্যায় তীক্ষ্ণধী বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে জড়বাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ অনেক পরিমাণে ঈদৃশ অনুসন্ধান-সমিতির ফল।

পঞ্চশত।

সম্রাটের মহা চতুরঙ্গ সেনা ভরিল চিতোর দেশ,
রাণা অমরের সেনা শুধু ছিল পাঁচশত অবশেষ।
নতশিরে সবে আসি দাঁড়াইল রাণার পতাকা তলে,
স্থিরির প্রধান সালুম্বা গোবিন্দ নত শিরে আজি বলে,—
"যাহা সাধ্য ছিল করেছি আমরা সন্ধি কর মহারাজ"
বাধিয়ে আমায় ভীষণ আহবে এই কি তোমার কাজ?
বলি নাই আমি হবে সর্ব্বনাশ? বুঝিতে সম্রাট সহ?
তুমিই ভাঙ্গিলে সোণার মুকুর আজি পুরস্কার লহ।
প্রতাপের সুত প্রতাপ সমান বুঝিবে সমরাঙ্গনে।
কি দেখে তোমরা সেনাপতিগণ, বুঝিবে না এই রণে?"
গর্জ্জিয়া উঠিল পঞ্চশত বীর সকলেই শ্মশ্রুহীন,
শিশুর গরজে বুঝিল চিতোর আজি কি ভীষণ দিন।
চলিলা অমর শিশুসৈন্য সহ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মাঝে,
আইল লক্ষ মোগল সেনানী দৈত্য ভীষণ সাজে।
গরজিল শত প্রচণ্ড কামান ঝলকে কৃপাণ কত,
অটুট হইয়া রহিল দাঁড়ায়ে চিতোরের পঞ্চশত।

করিছে গর্জ্জন ভীষণ কামান বজ্র ধ্বনির মত।
কাঁপে না তাহাতে কাহারও হৃদয় চিতোরের পঞ্চশত।
ঝলসিছে শূন্য কিরণে লোহিত কৃপাণ শোণিত-লিপ্ত
যুঝিছে বিক্রমে অচল অটল পঞ্চশত রণ-দৃপ্ত।
বাজিছে গভীরে সমর বাজনা মাতায়ে সকল দেশ,
মাচিছে আজিকে সমর তরঙ্গে চিতোরের অবশেষ।
গরজে গভীরে উচ্ছ্বাসে বহিয়া মোগলের সিংহনাদ,
হাসিয়া হাসিয়া দিতেছে পরাণ জীবন আহুতি সাধ।
হাসিতে হাসিতে অমরের সেনা ব্যূহভেদে মহাবলে।
বহিল বিপুল শোণিতের স্রোত মোগল সেনানী দলে।
লক্ষ সেনা সহ কেমনে যুঝিবে বলবা যুঝিবে কত,
অর্দ্ধ শোণিতে ধারায় লুটায় অমরের পঞ্চশত।

আবার গরজে ভীষণ কামান গরজে ভীষণ সেনা।
গরজে অমর "আজি শোধি মোরা দেশের সকল দেনা
হাসিতে হাসিতে যুঝিছে বালক, পুত করি মাতৃস্তন্য।
হায় পাঁচশত ধরার মাঝে বীরত্বে তোমরা ধন্য।
হাসিতে হাসিতে ধরায় লুটায় লভিয়া বিষম ক্ষত,
তথাপি যুঝিছে ভীষণ প্রতাপে অমরের পঞ্চশত।

কোথায় তুলনা এহেন সেনার খুজিয়া জগতময়।
দেশ তরে রাজ্য এমন করিয়া করিছে শমন জয়।
নহে শিশুনাশী মোগলের সেনা এযুদ্ধে যাহারা জয়ী,
আজি পঞ্চশত অমরের সেনা ধরায় তুলনা কই।
ধিক মোগলের শত কামানেরে ধিকরে কৃপাণ হাত।
দেশ জয় করি স্বরগ জিনিলা অমরের পঞ্চশত।

চাহিল অমর সম্মুখে পশ্চাতে দেখিল যুবক সেনা,
শেষ বিন্দুরক্ত দিয়া শোধিয়াছে দেশের সকল দেনা।
বলিলা উচ্ছ্বাসে প্রতাপ-তনয় আজিই তোমরা ধন্য,
স্বর্গ জয় করি করিয়াছ পুত তোদের জননী-স্তন্য।
বধ মোরে এবে চিতোরের রাণা লুটাক সমরাঙ্গনে।
দাঁড়াইলা বীর উন্মুক্ত কৃপাণ ভীমসেন যেন রণে,
পলাইলা সবে মোগল সেনানী সম্মুখে পড়িল যত।
দাঁড়াল অমর জাতি শত্রু যথা সেনাপতি মহাব্রত।
করহে আমায় কৃপাণ আহুতি তুমিই আমার যোগ্য।
বিশ্বাসঘাতক তব রাণা সুত চিতোর তোমার ভোগ্য।
রোমাঞ্চিত কায় ম্লেচ্ছ-সেনাপতি না ছোয় একটী কেশ
ধন্য পঞ্চশত সেনা এ জগতে চিতোরের অবশেষ।
রোমাঞ্চ বিহ্বল অসীম বীরত্বে হইলেন মহাব্রত,
এ জগতে ধন্য অমরের সেনা বালক পঞ্চশত।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

৺পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতির্ণার্ণব।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এখন বঙ্গদেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চা বড়ই অল্প। এই প্রদেশেই এক সময়ে পঞ্চকোটের রাজার প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ নবদ্বীপনিবাসী হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণব, নানা জ্যোতিষ গ্রন্থের টীকাকার নবদ্বীপনিবাসী কমলাকর জ্যোতিষী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধান জ্যোতিষী সত্যদেবসরস্বতী, নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পঞ্চরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন রামরুদ্রবিদ্যানিধি, নাটরের মহারাজ রাম-

কৃষ্ণের প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত রামচরণ সর্ব্বজ্ঞ, বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ হরিদেববিদ্যানিধি প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় জ্যোতির্ব্বিদ্‌বর্গ দ্বারা গণিতশাস্ত্র ও ফলিত জ্যোতিষের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। রাজা ও জমিদারেরা পুরশ্চরণ কালে গ্রহণ গণনা করাইয়া জ্যোতিষী পণ্ডিতগণকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিতেন। এখন আর দেশে সেরূপ বেদ-বোধিত ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান হয় না। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজের লোকেরা একাদশীর কথা অথবা অন্যান্য ব্রত নিয়মের দিন কিংবা অশৌচের ব্যবস্থা লইবার জন্য জ্যোতিষীর বাটীতে যাইতেন, এখন ছাপার পঞ্জিকা বাহির হওয়ায় জ্যোতির্ব্বিদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় না। এদিকে নিতান্ত বক্ষণশীল জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের বংশধরেরা অন্য কোন অর্থকরী বৃত্তি অবলম্বন না করায় দিন দিন তাঁহাদের দারিদ্র্য-বৃদ্ধি ও সংখ্যা-হ্রাস হইতেছে। অনেক বিখ্যাত জ্যোতিষীর বংশধরগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূম্যধিকারি-বর্গের প্রদত্ত ব্রহ্মত্র ভূমি ও দেবত্র ভূমিই একমাত্র জীবিকার অবলম্বন হইয়াছে। কাহারও কাহারও বা তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে বঙ্গদেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনার অভাব হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? সর্ব্ব শেষে যিনি গণিত শাস্ত্র ও ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চা দ্বারা বঙ্গদেশে উভয় শাস্ত্রকে জীবিত রাখিয়াছিলেন, সংপ্রতি তিনিও স্বর্গে গমন করিলেন। পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণবের মৃত্যুতে বঙ্গীয় জ্যোতির্ব্বিৎ-সমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনও পূর্ণ হইবার নহে। এই পণ্ডিতবরের সহসা অন্তর্ধানে অনেক চতুষ্পাঠীর ও কলেজের অধ্যাপক ছাত্র এবং বহু বিষয়ী ব্যক্তি কবিতা ও পত্র দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করেন, সে সমুদয়ের উল্লেখ করা অসম্ভব, বিশেষ অনুরোধে একটী মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। অবশেষে এই অস্তমিত জ্যোতিষীর জীবনের ঘটনাবলী অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(বঙ্গের অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ
গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা-প্রণেতা
বেঙ্গল গবর্মেণ্টের পঞ্জিকাকার
ভারত-গবর্মেণ্টের বৃত্তি-প্রাপ্ত
পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের
পরলোক গমনে শোকোচ্ছ্বাস।)

(কবিতা)

আসীৎ সর্ব্বগুণাকরঃ কৃতিবরঃ প্রখ্যাত
বিশ্বম্ভরঃ,
শ্রীবিশ্বম্ভর-ভক্তিভাজনপরঃ সিদ্ধান্তশাস্ত্রাকরঃ।
গুপ্তপ্রেস-সুমুদ্রিতাং বুধমতাং সৎপঞ্জিকাং
সৃষ্টবান্,
হা। সোঽয়ং নিয়তের্দশাদ্ বিধিকৃতাৎ
স্বর্গং গতঃ সাম্প্রতম্ ॥১॥

(অনুবাদ)

যিনি সকল গুণের আকর, বিষ্ণুসেবায় তৎপর এবং সমুদয় জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তের বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, যাবতীয় পণ্ডিতবর্গের সম্মত সুমুদ্রিত শ্রেষ্ঠ গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা যৎকর্ত্তৃক প্রণীত হইত, হায় কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে সেই মহামনীষী সংপ্রতি স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥১॥

জ্যোতিষার্ণবোপনামা, শ্রীনবদ্বীপধাম স্থিত ধামা।
স্মৃত্বা স্বস্বেষ্টমন্ত্রং, স্বর্যযৌ পরিহায় স্বতনুম্ ॥২॥

যাঁহার উপাধি "জ্যোতিষার্ণব" যিনি শ্রীনবদ্বীপধামে অবস্থিতি করিতেন। তিনি

ইষ্টদেবকে ধ্যান করিতে করিতে স্বীয় পার্থিব দেহ পরিহার পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ২ ॥

জ্যোতির্ব্বিৎ-প্রববস্য তস্য বিবহাৎ সংশোচ্যমানা ভৃশম্,

আচার্য্যান্বয়ভূষণস্য চ বয়ং সর্ব্বে ভবামোঽহর্নিশম্।

যে যেঽস্মৎকুলসম্ভবাঃ কতিপয়ে জ্যোতির্ব্বিদস্মাদৃশাঃ ?

কোবা তন্মহতঃ সমুন্নতপদং তেষাং প্রলব্ধুং ক্ষমঃ ॥৩॥

জ্যোতির্ব্বিৎ আচার্য্যকুলেব অলঙ্কাবস্বরূপ সেই প্রখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদেব বিবহে আমবা নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়াছি, আমাদেব কুলে যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ আছেন, তন্মধ্যে কয় জন তাঁহাব ন্যায় কৃতী পুরুষ, এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই বা তাঁহাব ন্যায উন্নত পদ লাভ কবিতে সমর্থ ॥৩॥

রাজ্যেশ্বব-শ্রেষ্ঠবিচাবমন্দিবে,
সর্ব্বাদৃতা তৎকৃতপঞ্জিকা-গ্রহাৎ।
পঞ্চাঙ্গ-শাস্ত্রে দিনকৌমুদী কতা,
গ্রাহ্যা সুধীরৈবপি সা সমাদবাৎ ॥৪॥

রাজ্যেশ্ববেব শ্রেষ্ঠ-বিচাব-মন্দিবে (হাইকোর্টে) আগ্রহেব সহিত সর্ব্বজন-সমাদৃত তৎকৃত পঞ্জিকা গৃহীত হইত। পঞ্চাঙ্গশাস্ত্র সংক্রান্ত "দিনকৌমুদী' নামক গ্রন্থ বঙ্গীয এসিয়াটিক সোসাইটিব অনুমতি অনুসাবে তিনি সংশোধিত, মুদ্রিত ও স্বয়ং তাহাব বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন এবং সকলেই উহা সমাদবের সহিত গ্রহণ কবিয়া থাকেন ॥৪॥

পঞ্চাঙ্গ-সাধন সুবিস্তব দর্পণেন,
যঃ প্রাতিবিম্বীকৃত-দেশযশঃ সমাপ্তঃ।
যেনোপদিষ্ট-বিধিনা বিধিমাচবংস্তে
বিদ্বদ্গণাঃ কিমুত তস্য গুণং বদামঃ ॥৫॥

পঞ্চাঙ্গ সাধনের সুবিস্তৃত দর্পণের ন্যায় যে গ্রন্থ দ্বারা প্রতিবিম্বিত দেশের যশ যিনি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহার উপদিষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা ধর্ম্ম-প্রাণ প্রসিদ্ধ মনীষিগণ বৈধক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহার গুণেব আব অধিক কি প্রশংসা করিব ? ॥৫॥

অস্মাকং দুবদৃষ্টতোঽস্তমগমদ্ বিশ্বস্তবো ভাস্কবঃ,

তস্মাদ্ ধ্বান্তসমাকুলঞ্চ সমভূদাচার্য্যচিত্তাম্বরম্।

অস্মদ্ বংশভূতাং হোরাগমবিদাং তদ্ধ্বান্ত হন্তোদ্যমী।

যদ্যেকোঽপি পুনঃ ক্ষমস্তমসুবদ্ বন্ধুং প্রমন্যামহে ॥ ৬ ॥

আমাদেব দুবদৃষ্ট বশতঃ বিশ্বস্তবজ্যোতির্ম্মার্ণব রূপ ভাস্কব অস্তগত, আজ জ্যোতিঃশাস্ত্রেব আচার্য্যগণেব হৃদয়াকাশ অন্ধকাবে আবৃত। আমাদেব এই হোবাশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেব বংশধবগণেব মধ্যে যদি একজনও সেই অন্ধকাব দূব কবিবাব জন্য উদ্যম কবেন, তাঁহাকে আমবা প্রাণেব বন্ধু মনে কবিব ॥ ৬ ॥

গণিত গুণগবিষ্ঠঃ পঞ্জিকা-বৃত্তিনিষ্ঠঃ,
ক্ষিতিপতি-ধনমানৈ র্যশ্চ লব্ধপ্রতিষ্ঠঃ।
পরিজনগণবাজিং ন্যায়তঃ পালয়িত্বা
স্বযমুপচিতবিত্তে র্জীবিকাং নির্ব্বাহ ॥ ৭ ॥

যিনি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত, যিনি পঞ্জিকা গণনাদ্বাবা সবিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সম্রাটেব অনুগ্রহ-প্রদত্ত ধন এবং সম্মান দ্বাবা যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সেই পণ্ডিতবব বিধিসঙ্গত বৃত্তি দ্বাবা পোষ্যবর্গের প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বর্গত হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

তস্যাভাবে গ্রহবটুকুলং ব্যাকুলং সর্ব্বদৈব,
কিন্ত্বস্মাকং বিহিতমধুনা চিন্তনীয়ং তদেব।
কে নোপায়েন তস্যোজ্জ্বলপদগবিমা
রক্ষণীয়স্তদেব,

জ্যোতির্বিদ্ভিশ্চ সর্ব্বৈরপি কুলজগণৈ
রাগুতৎ কার্য্য মেব ॥ ৮ ॥

তাঁহার (বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণবের) অভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যায়ী গ্রহবিপ্রকুলসম্ভূত বালকগণ নিতান্ত ব্যাকুল, আমাদের কি করা কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তার বিষয়; কি উপায়ে তাঁহার উজ্জ্বল পদগরিমা রক্ষা হয়, কুলীন জ্যোতির্ব্বিদ্ গ্রহবিপ্রমণ্ডলীর শীঘ্রই তাহা করা কর্ত্তব্য ॥ ৮ ॥

জ্যোতিজ্ঞে চাতিবিজ্ঞে ত্রিদশপুরগতে সদ্-
গুণজ্ঞেঽপি তস্মিন্,
শোকাচ্ছন্না বিষণ্ণাস্তদনুপরিজনাস্তদ্বিয়োগাদ্
বভূবুঃ।
অন্তর্যামীষ্টদাতা সকরুণহৃদয়ঃ শান্তিদঃ
শ্রীমুরারিঃ,
তেষাং শোকাকুলানাং পরিহরতু শুচং শান্তি-
সৌখ্যং দদাতু ॥ ৯ ॥

অতিশয় বিদ্বান্ এবং গুণজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্ (বিশ্বম্ভরজ্যোতিষার্ণব) সুরলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহার বিচ্ছেদে তদীয় পরিজনবর্গ শোকে আচ্ছন্ন এবং নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছেন। অন্তর্যামী মঙ্গলবিধাতা করুণহৃদয় শান্তিদাতা ভগবান্ বিষ্ণু সেই শোকাকুল পরিবারের শোক বিদূরিত করুন এবং শান্তিসুখ প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

ঢাকা-পূর্ব্ববঙ্গ বিক্রমপুরান্তর্গত ধামরণ-গ্রাম নিবাসিনঃ জ্যোতির্ব্বিদধ্যাপকস্য শ্রীরাজমোহন বিদ্যানিধেঃ।

(সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত)

পণ্ডিত বিশ্বম্ভরজ্যোতিষার্ণব মহাশয় ১৭৭৯ শকের (১২৬৪ সালের) ২৫শে কার্ত্তিক মধ্যাহ্ন কালে জন্ম গ্রহণ করেন। গৌড়দেশের অধিপতি রাজা শশাঙ্ক গ্রহযাগ সম্পাদনের নিমিত্ত সরযূতীর হইতে যে দ্বাদশটী বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহারা রাজার গ্রহযাগ সম্পন্ন করিয়া সস্ত্রীক এদেশে বসতি স্থাপন করেন এবং সাধারণের মধ্যে গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত হন। ঐ দ্বাদশ ব্রাহ্মণের অন্যতম প্রজাপতির বংশে কমলাকর মিশ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক খানি জ্যোতিষ-গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছিলেন। সাধারণের মধ্যে তিনি কমলাকরজ্যোতিষী নামে খ্যাত ছিলেন। কমলাকর পশ্চিম রাঢ় হইতে আসিয়া নবদ্বীপে বাস করেন। তাঁহার অধস্তন বংশধরগণ ধারাবাহিক রূপে সকলেই পণ্ডিত ছিলেন। বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় প্রদান করা হইল না। কমলাকর হইতে ৮ম পুরুষ শতানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় কোন আত্মীয়ের অনুরোধে যশোর জেলার অন্তর্গত (এখন ফরিদপুরের অন্তর্গত) ধর্ম্মহাটি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ঐ স্থলে তাঁহার বিলক্ষণ বৈষয়িক উন্নতি হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে পাঁচটী পুত্র সহ চন্দনা নদীর তীরস্থ খালকুলা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ঐ পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উমাকান্তবিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের চারি পুত্র হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় ৺পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই এই পরলোকগত পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণবের পিতা এবং উক্ত খালকুলা গ্রামই তাঁহার জন্মভূমি। জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের পিতা পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় দেশবিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন, এবং নানা স্থান হইতে তাঁহার নিয়ত আহ্বান হইত। তিনি যেমন সদাচার এবং সৎকর্ম্মান্বিত ছিলেন, তেমনি তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য ও পরোপকার-প্রবৃত্তি যথেষ্ট ছিল। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জীবিত থাকিতে তাঁহার সাংসারিক

অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল। উক্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চারি পুত্রের মধ্যে বিশ্বম্ভরজ্যোতিষার্ণব জ্যেষ্ঠ। তিনি শৈশবে স্বগ্রামস্থ মধ্যবাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। শৈশব হইতেই অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার গাঢ় অভিনিবেশ ছিল। একবার জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব স্কুল্ পরিদর্শন করিতে আসিলে তিনি অতি-ক্ষিপ্রত্বের সহিত অঙ্ক কসিয়া মাজিষ্ট্রেটের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। পিতার ইচ্ছা ক্রমে স্কুল্ ছাড়িয়া জ্যোতিষার্ণব মহাশয় প্রথমে পিতার নিকট, তাহার পর, মেগচামী গ্রাম নিবাসী ৺দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। কিছু দিন পরে বাগাট গ্রাম নিবাসী ৺বামচন্দ্র তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট উক্ত ব্যাকরণ ও কোঁড়কদী গ্রাম নিবাসী ৺কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল অধ্যাপকের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় তাঁহার নিকট ব্যাকরণ ব্যতীত স্মৃতিশাস্ত্রও পাঠ করিতেন। প্রথমে তিনি পিতার নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সর্ব্বদা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার সময় অভাবে জ্যোতিষার্ণব মহাশয় মধ্যে মধ্যে দূর-তর স্থানে গিয়া কয়েক খানি গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আসেন। তাঁহার বয়স যখন ১৯ বৎসর, সেই সময় পিতৃদেব পীতাম্বরবিদ্যাবাগীশ মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, বিশেষ পাঁচটী কন্যার বিবাহ ও নানা বৈধক্রিয়া ব্রত নিয়মাদি সম্পন্ন করায় কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা কিছু ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ঐ সময় সংসারের সমস্ত ভার জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের স্কন্ধে নিপতিত হইল। কিন্তু ইহাতে তিনি কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না; দেশের মধ্যে পিতার বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল, পিতার ন্যায় জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ও নানা স্থানে আহূত হইতে লাগিলেন। তাহাতেই সংসার একরূপ চলিতে লাগিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও তিনি অধ্যয়নে বিরত হইলেন না। কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই সর্ব্বদা সাংসারিক গাঢ় অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। একুশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তিনি প্রথমে গৃহে যে সকল জ্যোতিষ গ্রন্থের হস্তলিপি ছিল, সমুদয় নিজে নিজে বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, যে সকল স্থানে সন্দেহ থাকিত, কোন বিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সন্দেহ-চ্ছেদ করিয়া লইতেন। এক দিবস একটী ঘটনা ঘটে, উহাই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী অভিজ্ঞতার কারণ হয়।

জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের জন্মভূমি খালকুলা গ্রামে ভিন্ন গোত্রীয় ৺শশিনাথ আচার্য্য নামক এক আত্মীয়ের গৃহে কতকগুলি দুর্লভ গ্রন্থ ছিল। ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াই তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অনন্যসাধারণ জ্ঞান লাভ করেন। প্রবাদ এইরূপ;—শশিনাথ আচার্য্যের পূর্ব্ব পুরুষ কোন ব্যক্তি স্বশ্রেণীস্থ কোন বৃদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত করেন এবং তাঁহার প্রতি অবমাননা-সূচক বাক্য প্রয়োগ করেন। ইহাতে উক্ত বৃদ্ধ জ্যোতিষী সর্ব্ব সমক্ষে অপ-দস্থ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হন এবং এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন, "তুমি যেরূপ গর্ব্বিত

তোমার বংশে কাহারও বিদ্যা হইবে না, যদি বিদ্যা শিক্ষা করে, সে অল্পায়ু হইবে"। এই রূপ শুনা যায়, ঐ অভিশপ্ত ব্যক্তির পুত্র নাকি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যৌবন-কালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার বংশধরেরা বহু পুরুষ পর্য্যন্ত আর বিদ্যা শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেন নাই। শশিনাথ আচার্য্যের পিতা বৈদ্যনাথ আচার্য্য এই কিংবদন্তীর যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য দেওঘরে গিয়া বৈদ্যনাথের মন্দিরে প্রায়োপবেশন * করেন। অর্দ্ধরাত্রে স্বপ্নাদেশ হয় "তুমি বিদ্যা শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিও না, ব্রহ্মশাপ অতিক্রম করিতে পারিবেনা, তুমি অথবা তোমার বংশধরেরা বিদ্যা শিক্ষার ফল লাভ করিতে পারিবে না"। বৈদ্যনাথ উহা সকলের নিকট ব্যক্ত করিয়া বিদ্যা শিক্ষায় নিরস্ত হন। তিনি এক তেজস্বী পণ্ডিতের কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র হইলে তাঁহার গৃহিণী ঐ অভিসম্পাতের কথায় কর্ণপাত করেন না, শৈশবে পুত্র শিবনাথকে পাঠশালায় প্রেরণ করেন। পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইলে শিবনাথ চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতা এবং জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু শিবনাথ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন "মরি যদি লেখা পড়া শিখিয়া মরিব, মূর্খ হইয়া বাঁচিয়া থাকিব না।" শিবনাথ অত্যন্ত বলিষ্ঠ-দেহ এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে কলাপ-ব্যাকরণ, অমরকোষ প্রভৃতি অধ্যয়ন শেষ করিয়া গয়াধামে জ্যোতিষ পড়িতে যান। † কিছু দিন ঐ স্থানে অধ্যয়ন করিয়া কাশীতে গমন করেন। কাশীতে তিনি বহুদিন ছিলেন। তাহার পর, তিনি দক্ষিণভারতে গমন করেন। দ্রাবিড়-পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থান কণ্ঠতী এবং কালহস্তীশ্বর প্রভৃতি স্থানে বহু দিন জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে একগাড়ী জ্যোতিষ গ্রন্থ লইয়া উড়িষ্যার পথে গৃহে ফিরিয়া আসেন।

শিবনাথের জ্ঞান-লিপ্সা অত্যন্ত বলবতী ছিল। তিনি পরকীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া পদব্রজে সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। অনেক সময় ভারবাহীর অভাবে কোন বিশ্বস্ত গৃহস্থের গৃহে পুস্তকরাশি রাখিয়া নিজ মস্তকে করিয়া বাবদ্বার বহন পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইত। তিনি গৃহে ফিরিয়াই অসমাপ্ত হস্ত লিপিগুলি শেষ করেন এবং প্রত্যেক গ্রন্থের দুরূহ স্থানগুলির অতি সহজ সংস্কৃতে টিপ্পনী লেখেন। শিবনাথ কেবল শাস্ত্রীয় ব্যবসায় করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন, এই অবস্থায় ছত্রিশ বৎসর বয়সে হটাৎ কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি দুইটী পুত্র রাখিয়া যান, জ্যেষ্ঠের নাম শশিনাথ এবং কনিষ্ঠের নাম ঈশাননাথ। ইঁহারা দুই জন ভয়ে অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ! অনেকের ধারণা আছে, পুত্র পিতার অপেক্ষা অধিক আয়ুঃ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ছত্রিশ বৎসরমাত্র-আয়ু শিবনাথের পুত্র শশিনাথ অশীতি বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র হয়। পুত্রটী জ্যোতির্ণব মহাশয়ের সহাধ্যায়ী, ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে উঠিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শশিনাথ, ঈশাননাথ, উভয় ভ্রাতাই যদিও নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু পৈতৃক

* প্রায়োপবেশন—হত্যা দেওয়া।

† তখন গয়াধামে কয়েক জন বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন।

গ্রন্থগুলি অতিসাবধানে রক্ষা করিতেন, কেহ দেখিতে চাহিলে প্রাণান্তেও বাহির করিতেন না। অনেকে বলিত, তাঁহাদের পিতার কষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি দ্বারা অপরে পাণ্ডিত্য লাভ করিবে, ইহা বড় তাঁহারা পছন্দ করিতেন না। একদিন ভাদ্র মাসের প্রখর রৌদ্রে ঈশান নাথ আচার্য্য মহাশয় পুস্তকগুলি অঙ্গণে মাদুর পাতিয়া শুকাইতে দিয়াছেন, ঐ সময় জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের চক্ষে উহা পড়িল। তিনি মাদুরে ঢিল চাপা দেওয়া একখানি পুঁথির পাতা লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেই টিপ্পনীযুক্ত পুস্তকের বিষয় বুঝিতে তাঁহার কষ্ট হইল না। তিনি তন্ময়চিত্তে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া উহা পড়িতে লাগিলেন। রৌদ্রে মুখ আরক্ত, সমস্ত অঙ্গ বহিয়া ঘাম পড়িতেছে, কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টিপাত নাই। ঈশাননাথ আচার্য্য তাহা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া লইয়া জ্যোতিষার্ণব মহাশয়কে বারান্দায় বসাইলেন এবং বলিলেন "ওসকল পুঁথি কি তোমরা বুঝিতে পারিবে? ও সকল বিদ্যা এ দেশে কেহ জানে না, পিতা ঠাকুর দেশ দেশান্তরে গিয়া উহা শিখিয়া লিখিয়া আনিয়াছিলেন"। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় বলিলেন "আমি কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছি, আমাকে একখানি পুঁথি কয়েক দিনের জন্য দিউন, আমি শীঘ্রই ফিরাইয়া দিব"। অনেক ওজর আপত্তি পর ঈশাননাথ আচার্য্য মহাশয় একখানি গ্রন্থের ১০টী পাতা গণিয়া দিলেন। সেই দিন হইতে নানাবিধ ফরমাইস খাটিয়া ও নানা প্রকারে উক্ত আচার্য্য মহাশয়কে সন্তুষ্ট রাখিয়া জ্যোতিষার্ণব মহাশয় দুই বৎসরের মধ্যে নিজ গৃহে উহার যে সকল পুস্তক ছিল, তদ্ভিন্ন প্রায় সমস্ত পুস্তকের প্রতিলিপি করিয়া লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অভিনিবেশ সহকারে উহা উত্তম রূপে বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করিলেন। এই রূপে তাঁহার চারি বৎসরের মধ্যে গণিত—পঞ্জিকা গণনা, গ্রহস্ফুট, গ্রহণগণনা ও জাতক-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম রূপে আয়ত্ত হইল। এই সময়ে তিনি সাংসারিক কার্য্যে অতি অল্প সময়ই ব্যয় করিতেন, অধিকাংশ সময় পাঠে নিরত থাকিতেন।

কিছুদিন পরে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়-অনুজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় নবদ্বীপ হইতে বারাণসী ধামে অধ্যয়ন করিতে গেলেন, সেখানে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইত। তৃতীয় অনুজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রবিদ্যাভূষণ মহাশয় ও চতুর্থ অনুজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য মহাশয়, ইঁহারা দুইজনে গ্রামের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদির ব্যয় যোগাইতে হইত। এই সকল কারণে তখন অধিকাংশ সময় সাংসারিক কার্য্যে ব্যয় করিতে হইত। তিনি যখনই সময় পাইতেন, পাঠে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। একবার গ্রীষ্মাবকাশের সময় "সাধারণী" পত্রিকায় (শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত) একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, "যিনি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার কোনরূপ ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২৫ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইবে"। তখন চারি ভ্রাতাই গৃহে, সকলেই উৎসাহের সহিত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া উক্ত পঞ্জিকার গ্রহস্ফুট ও উপনয়নের দিনেই কয়েকটী ভ্রম দেখিতে পান। উক্ত ভ্রান্তি উল্লেখ পূর্ব্বক জ্যোতিষার্ণব মহাশয় সাধারণীতে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। গুপ্তপ্রেসের পক্ষ হইতে একটী পণ্ডিত উহার প্রতিবাদ করেন,

কিন্তু পর সপ্তাহের পত্রিকায় জ্যোতির্ণব মহাশয় উক্ত প্রতিবাদের উত্তর দিলে আর তাঁহারা কোন কথা বলেন না। কয়েকদিন পরে গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠাতা ৺দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় উক্ত প্রতিশ্রুত পারিতোষিকের টাকা, সেই বৎসরের কয়েকটী গ্রহণ গণনা করাইয়া লইয়া তাহার পারিশ্রমিক রূপে অর্পণ করেন। তাহার পর, প্রথম গ্রহণটী জ্যোতির্ণব মহাশয়ের লিখিত দণ্ড পল বা ঘণ্টা মিনিটের সহিত মিলিলে তিনি সুদীর্ঘ এক পত্র লিখিয়া জ্যোতির্ণব মহাশয়কেই গুপ্তপ্রেশের পঞ্জিকাকারের পদে নিযুক্ত করেন। জ্যোতির্ণব মহাশয়, গুপ্ত মহাশয়ের বিনয় এবং শিষ্টাচারে একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া আনন্দের সহিত উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তিনি ৩৮ বর্ষ কাল গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে উক্ত পঞ্জিকার তিথি নক্ষত্র গণনা, গ্রহস্ফুট, শুভদিন অথবা বৈধ ক্রিয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন বিষয়ে ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। স্মৃতির ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা ছিল, এরূপ অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে শুধু জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও স্মৃতির ব্যবস্থায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা নহে। জ্যোতির্ণব মহাশয় একজন সুনিপুণ পুরোহিত ছিলেন। অনেক পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী তাঁহার নিকটে আসিয়া শ্রাদ্ধাদির কার্য্যের খোলাকাটা, ডোঙ্গা তয়েরি, হস্তকুশ মুকুট নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণ বাঁধা, পূজাদিতে প্রদর্শিত মুদ্রা করণ প্রভৃতি শিখিয়া যাইতেন। জ্যোতির্ণব মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, একবার তিনি একস্থানে গ্রহযাগ করিতে গিয়াছিলেন। যাগকর্ত্তার জ্ঞাতির বাটীতে একটী সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হইতেছে। জ্যোতির্ণব মহাশয়ও সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলেন। তিনি অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময় শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যাঁহার পিতার সপিণ্ডীকরণ, তিনি একজন নব্য শিক্ষিত অথচ আস্তিক ব্যক্তি। তিনি বলেন "মহাশয়! শ্রাদ্ধ শেষ হইল অথচ পিতার পিণ্ড প্রদত্ত হইল না, ইহার কারণ কি?" প্রকৃত কথা, পুরোহিত পিণ্ড-সমন্বয় জানেন না, ডোঙ্গাগুলি পর্য্যন্ত বসাইতে ভুল করিয়াছিলেন। পুনরায় অন্নপাক হইলে জ্যোতির্ণব মহাশয় যথাবিধি খোলা ডোঙ্গাগুলি বসাইয়া দিলেন এবং কাহার পিণ্ডের সহিত কাহার পিণ্ডের সমন্বয় হইবে বলিয়া দিলেন, তাহার পর, শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইল। একবার তাঁহার বাটীর সন্নিহিত গ্রাম নিবাসী এক পেন্‌সন্‌-প্রাপ্ত সবজজ্‌ একটী জলাশয় উৎসর্গ করেন। সবজজের ইচ্ছা উক্ত ক্রিয়াটী যথাবিধি সম্পন্ন হয়। চারিজন পুরোহিত আহূত হইলেন, কিন্তু যজ্ঞ ও নাগদণ্ডের পরিমাণ ও প্রোথিত করার বিধি বিষয়ে পরস্পর মত-ভেদ উপস্থিত হইল। ফল কথা, পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর বৎসরে বৎসরে জলাশয় উৎসর্গ হয় না, সুতরাং যে চারিজন পুরোহিত সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই পুষ্করিণী উৎসর্গ কার্য্য সম্পাদন করেন নাই, নিজ কল্পনা অনুসারে যাহা বলিতেছিলেন, সমস্তই ভুল, সবজজ্‌ মহাশয়ের জেরায় তাঁহাদের ভুল ধরা পড়িতেছিল। শেষে তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন, "বিশ্বম্ভর জ্যোতির্ণব এ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাকে ডাকুন। তার পর, জ্যোতির্ণব মহাশয় গিয়া মুখে মুখে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। সবজজ্‌ বলিলেন "মুখের কথায় হইবে না, লিখিয়া দিউন।" তাহার পর, সুন্দর রূপে স্বস্তিবাচন

হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন্ অনুষ্ঠানের পর কোন্ অনুষ্ঠান, কোন্ যাগের পর কোন্ যাগ, নাগদণ্ডের পরিমাণ আকার, কোন্ দিকে মুখ করিয়া প্রোথিত করিতে হইবে, সমুদয় লিখিয়া দেন। জলাশয়-উৎসর্গ শেষ হইলে সবজজ মহাশয় জ্যোতিষার্ণব মহাশয়কে প্রায় পুরোহিতের তুল্য দক্ষিণা প্রদান করেন এবং বলেন "এই মুসাবিদাটী যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হইবে, যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমার মত অনেকেরই গোলে পড়িবার সম্ভাবনা।" কিছু দিন পরে নবদ্বীপের বিদ্যার্ণব বংশের সর্ব্বশেষ পুরুষ ৺দুর্গাদাস বিদ্যারত্নের মৃত্যু হইলে নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ মহোদয় জ্যোতিষার্ণব মহাশয়কে হাইকোর্টের পঞ্জিকা-কারের পদে নিযুক্ত করেন। তাহার পর, বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্ট ও ইষ্টারন বেঙ্গল এবং আসাম গবর্মেণ্টও জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের নিকট হইতে পঞ্জিকা লইতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ সারদা-মঠের বর্ত্তমান পীঠাধীশ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যস্বামী কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া পঞ্জিকা সংস্কারের উদ্দেশ্যে বোম্বাই নগরে একটী বিরাট সভা আহ্বান করেন। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় সেই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া যান এবং সংস্কৃত ভাষায় পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকেই বঙ্গদেশের জ্যোতির্ব্বিদবর্গের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

খালকুলা নিতান্ত পল্লীগ্রাম, সেখানে ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণের উচ্চশিক্ষার সুযোগ না থাকায় জ্যোতিষার্ণব মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতৃগণের পাঠ্যাবস্থায় পূর্ব্বপুরুষ-গণের অধ্যুষিত নবদ্বীপে আসিয়া পুনরায় বসতি স্থাপন করেন। এখানেও তাঁহার প্রতিপত্তির অভাব হয় নাই, নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ৺রাজকৃষ্ণ তর্ক-পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় ৺যদুনাথ সার্ব্বভৌম, স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকবর্গের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য হইয়াছিল। প্রায়ই অপরাহ্ণে পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপকবর্গ তাঁহার নিকট আগমন করিতেন। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় যেমন জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি দৈবকার্য্যেও তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। প্রতিবৎসর বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে তাঁহাকে অন্ততঃ পঁচিশ ছাব্বিশটী গ্রহযাগ ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন সম্পন্ন করিতে হইত। কোন কোন বৃহৎ গ্রহযাগে তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি মাণিক্য এবং তামাপিত্তলের তৈজস পত্র, বস্ত্র ও দক্ষিণাদিতে ছয় সাত টাকা পর্য্যন্ত পাইতেন। একাগ্র মনে দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠান করায় প্রায়ই তাঁহার অনুষ্ঠিত গ্রহ-যাগাদি সফল হইতে দেখা যাইত। ইদানীং বঙ্গদেশে জ্যোতিঃশাস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ে জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের মীমাংসাই শেষ মীমাংসা বলিয়া গণ্য হইত। তজ্জন্য বঙ্গের অধিকাংশ রাজা জমিদার তাঁহাকে আহ্বান করিতেন। অল্প দিন হইল, নদীয়ার বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের বিবাহেও জ্যোতিষার্ণব মহাশয় যোটক বিচার করেন। উভয় রাজবংশের পণ্ডিতবর্গই উক্ত মীমাংসায় সম্মতি প্রদান করেন। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি এসিয়াটীক সোসাইটীর অনুমতি অনুসারে 'রবি-সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী' ও 'বিদগ্ধতোষিণী' নামক

দুইখানি জ্যোতিষ গ্রন্থের সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

নবদ্বীপে বসতি স্থাপনের কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। তাহার পর হইতে তাঁহার শরীর উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইতে থাকে। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার প্যারালিসিশ হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের চিকিৎসায় কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করেন। ইদানীং বহু স্থান হইতে নিয়ত আহ্বান হইত, কিন্তু কোথাও যাইতে পারিতেন না, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা আয়ের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে তিনি বৃত্তির নিমিত্ত গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন। নয় মাস পরে সংবাদ আসে 'ষ্টেট্ সেক্রেটারি তাঁহার জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। ছয়মাস মাত্র তিনি "সাহিত্যিক বৃত্তি বা লিটারারি পেন্‌সন্" ভোগ করিয়াছিলেন। বিগত আশ্বিন মাসে (১৮৩৪ শকাব্দ) চুয়ান্ন বৎসর দশমাস বয়সে স্বীয় বাটী নবদ্বীপে ইষ্টদেবের ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জ্যোতির্ষার্ণব মহাশয় সেকেলে ধরণের ব্যক্তি, সরলপ্রকৃতির পণ্ডিত ছিলেন। প্রত্যহ যথাবিধি নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন এবং নিরাড়ম্বরে জীবন যাপন করিতেন। তিনি কখনও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন না, অথচ তাঁহার কলিকাতা আগমনের পর হইতেই শত শত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আগমন করিতেন। তাঁহার ছয়টী পুত্র ও দুইটী কন্যা বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র জ্যোতীরত্ন গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা, হাইকোর্টের পঞ্জিকা প্রভৃতির গণনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের আর একটী রত্নের সংপ্রতি তিরোধান ঘটিয়াছে। ঐ অল্পায়ু তরুণ যুবা জীবনে এমন কোন কৃতিত্ব দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই, যাহাতে তাঁহার নাম মাসিক পত্রে স্থান পাইতে পারে। তবে এই স্বর্গীয় যুবক শৈশব হইতে যে চরিত্রের একটী পবিত্র আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অনেক বালকের অনুকরণীয়। এই যুবার নাম ৺ শৈলেশচন্দ্র আচার্য্য। ইনি পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈলেশচন্দ্র সম্পূর্ণ গৌরাঙ্গ এবং সুন্দর সুগঠিত দেহ লইয়া ভূমিষ্ঠ হন। শিশুকালে তাঁহার মুখের সৌন্দর্য্য ও প্রফুল্লতা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। ঐ বালক শাস্ত্রী মহাশয়-দিগের চারি ভ্রাতার সমান স্নেহভাজন ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাহার ব্যবহার এত সংযত ছিল যে, এই বালকের কার্য্য কলাপের জন্য কখনও কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অভিযোগ শুনিতে হয় নাই। পাঁচ বৎসর বয়সে বালকের মাতৃবিয়োগ হয়, (শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম পক্ষের পত্নী স্বর্গারোহণ করেন)। যে সময় বালক শুভ্র উত্তরীয় ও শুভ্র বসন পরিধান করিয়া স্বর্গীয়া জননীর উদ্দেশ্যে পিণ্ড-দান করিতেছিল, তখন নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়ার কুলকামিনীগণ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু বালক শৈলেশচন্দ্র কাঁদিয়া অধৈর্য্য হন নাই, ধীরভাবে যথাবিধি শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শৈলেশচন্দ্র প্রথমে তাঁহার খুল্লতাত তদানীন্তন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকটে থাকিয়া শিক্ষয়িত্রীর নিকটে, তাহার পর এভি স্কুলে, তৎপরে কলিকাতা সংস্কৃত কলিজিয়েট-স্কুলে, তাহার পর, কলিকাতা হিন্দু-স্কুলে পাঠ করেন। অবশেষে প্রেসিডেন্সী কলেজের কমার্সিয়াল্-

ক্লাসে সম্পূর্ণ তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহাধ্যায়িগণ তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, সাধুতা ও মধুর ব্যবহারে তাঁহাকে যার পর নাই স্নেহ করিতেন। প্রথমোক্ত তিনটী স্কুলে অধ্যয়ন কালে প্রত্যেক বার সচ্চরিত্রতার জন্য পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। একবার কোনও স্কুলে একটী পরীক্ষার সময় তত্ত্বাবধায়কগণের অনবধানতায় সকলেই পরস্পর দেখাদেখি করিয়াছিল। উহা জানিতে পারিয়া শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল, "শৈলেশ ব্যতীত আমরা সকলেই কিছু কিছু দেখাদেখি করিয়াছি"। কোন সময় বালকের পিতা পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় দুঃখ করিয়া বলেন, "আমার পুত্র নির্ব্বোধ নহে, তাহার স্মরণ-শক্তিও বিলক্ষণ আছে, অথচ পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হইতে পারে না, ইহার কারণ কি?" উত্তরে সংস্কৃত কলিজিয়েট্ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব আঃ হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ, মহোদয় বলেন, "আপনার দুঃখ করিবার কোন কারণ দেখিনা, শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি চরিত্র-গঠন হয়, তাহা আপনার পুত্রের যেরূপ হইয়াছে, এরূপ অন্য বালকের হয় নাই, সচ্চরিত্রতার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সে প্রথম।" শৈলেশ চন্দ্র বাল্যকাল হইতে পরিবারস্থ গুরুজনের আজ্ঞাকারী ছিলেন, যিনি যখন যাহা বলিতেন, বিনা আপত্তিতে তাহা সম্পন্ন করিতেন। খুড়-তুত জেঠ্-তুত ভাই ভগিনীদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এমন কি, পাড়ার বালক বালিকারা পর্য্যন্ত তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত ছিলনা। বাগানের ফুল, ছবির কাগজ প্রভৃতি দিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করিতেন। পাড়ার স্কুলের নাম-কাটা ছেলেরা চুরোট্ খাইয়া এবং নানা রকম বকামি করিয়া কাল কাটাইত। শৈলেশচন্দ্র উপনয়নের সময়কার ব্রতভিক্ষার টাকা ও পিতৃদত্ত জলখাবার পয়সা জমাইয়া নিজ গৃহে "সণ্ডে-লাইব্রেরী" নামক একটী লাইব্রেরি খুলিয়াছিলেন। কয়েকজন গ্রন্থকারও দয়া করিয়া এই লাইব্রেরিতে দুই চারিখানি পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত নিষ্কর্ম্মা বালকগণ ঐ লাইব্রেরি হইতে পুস্তক লইয়া পাঠ করিত, শেষে তাহারা পাঠে অনুরক্ত ও ভাল হইয়াছিল। অনেক সময় আত্মীয় স্বজন কিম্বা স্বদেশী লোক রুগ্ন-অবস্থায় মেডিকাল্ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া চিকিৎসিত হইতেন। শাস্ত্রী মহাশয় সকল সময়ে তাঁহাদের তত্ত্ব লইতে পারিতেন না, কিন্তু শৈলেশচন্দ্র নিয়মিতরূপে প্রতিদিন তাঁহাদের দেখিয়া আসিতেন এবং কোন বস্তুর অভাব হইলে পিতাকে জানাইয়া তাহা দিয়া আসিতেন। কোন কোন বালকের বিমাতার সহিত বনিবনাও হয় না, কিন্তু শৈলেশচন্দ্র আশৈশব তাঁহার বিমাতা কর্ত্তৃক অতি যত্নে ও স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বিমাতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। ইদানীং প্রবীণবয়স্ক পিতাকে স্বচ্ছন্দে বাখিবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা হইয়াছিল। পিতা প্রাতঃকালে লেখা পড়া লইয়া বসিতেন, তাঁহার সময়ের দিকে দৃষ্টি থাকিত না, সাড়ে আটটা বাজিলেই শৈলেশ চন্দ্র তাঁহাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিয়া আহ্নিক ও ঠাকুর পূজার আয়োজন হইয়াছে কিনা, দেখিতেন। কোন কারণে পূজার আয়োজনে বিলম্ব হইলে স্বয়ংই অগ্রে স্নান করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন। পাঠারম্ভ হইতে শৈলেশচন্দ্রের ইংরাজী-সাহিত্য, সংস্কৃত-সাহিত্য ও বাঙ্গালা সাহিত্যে অত্যন্ত

অনুরাগ ছিল, অবসর সময়ে তিনি প্রায়ই ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তক ও বাঙ্গালা মাসিক পত্র পাঠ করিতেন। অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার তত অভিনিবেশ ছিল না, কিন্তু গণিতে তিনি নিতান্ত অপটু ছিলেন না, কলিকাতা স্মলকজ্ কোর্টে একাউণ্ট ডিপার্মেণ্টে প্রবেশ করিয়া অতি যোগ্যতার সহিত উক্ত কার্য্য চালাইতে ছিলেন।

বিগত বৈশাখ মাসে শৈলেশচন্দ্র জ্বর কাশীতে আক্রান্ত হন। কিছুদিন কলিকাতার বাটীতে তাঁহার চিকিৎসা চলে, শেষে কবিরাজ ও ডাক্তারদিগের উপদেশ অনুসারে শাস্ত্রী মহাশয় পুত্রকে লইয়া গত শ্রাবণ মাসে ভিজিগাপটমে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন। শৈলেশচন্দ্র সমস্ত পথ নিজের সঞ্চিত পয়সা দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতে করিতে গিয়াছিলেন। বাটী থাকিতে ও কোন স্থানে যাতায়াত কালে অন্ধ খঞ্জ দেখিলেই দুই একটী পয়সা অতি সন্তর্পণে দিয়া প্রস্থান করিতেন। ভিজিগাপটমে অবস্থান কালে ক্রমে পরিচয় হওয়ায় দক্ষিণী পণ্ডিতগণ প্রায়ই শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসায় আসিতেন। শৈলেশচন্দ্র একদিন পৌরাণিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আপন্ন শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত সরল সংস্কৃত ভাষায় এবং অপর একটী ত্রৈলঙ্গী ভদ্র লোকের সহিত ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় ঐ দেশী একটী শিক্ষক ইংরাজীতে শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেন ;-"আমি কখনও বাঙ্গালা দেশে যাই নাই, কিন্তু বাঙ্গালীরা যে সুসভ্য, তাহা আপনার পুত্রের ব্যবহারে আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আপনি বলিতেছেন, আপনার পুত্র কেরানীগিরি করেন, কিন্তু ইনি কেমন সুন্দর ইংরাজী ও সরল সংস্কৃতে শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া কথা বলিতেছেন।" শৈলেশচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলিজেয়েট্ স্কুলেই অধিক দিন অধ্যয়ন করেন, তিনি ইংরাজীর সঙ্গে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও কয়েকখানি কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতের আদ্য-পরীক্ষা ও মধ্য-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণ মনের ভাব সংস্কৃতে প্রকাশ করিতে বেশ পারিতেন। তিনি অপরাহ্ণে সমুদ্র তীরে বসিয়া তাঁহার একটী সহাধ্যায়ী ও ভিজিগাপটমের হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সহিত সংস্কৃত সাহিত্য ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। শৈলেশচন্দ্র জীবনে কখনও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না, তিনি সমস্ত দিনে একটী পান অথবা সামান্য সুপারি মসলা দ্বারা মুখশুদ্ধি করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় ভিজিগাপটমে দুই মাস অবস্থান করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। ডাক্তারেরা পুনরায় তাঁহাকে দেওঘরে যাইতে বলেন। শৈলেশচন্দ্র দেড় মাস দেওঘরে ছিলেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা এত অধিক ছিল যে, দারুণ রোগ-যন্ত্রণাসত্ত্বেও পিতা ব্যাকুল হইবেন ভাবিয়া তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরেও যাতনার কথা ব্যক্ত করেন নাই। মৃত্যুর দিবস (১৬ই কার্ত্তিক, ১৮৩৪ শকাব্দ) অপরাহ্ণে তাঁহার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য মহাশয়ের পত্নীর মুখে রামায়ণ ও সায়ংকালে নানাবিধ স্তোত্র পাঠ শুনিলেন। পিতা অন্য গৃহে গেলে, সাশ্রুনয়না বালিকা পত্নীকে ডাকিয়া সঞ্চিত কিছু অর্থ সহ একটী বাক্স দেখাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া কয়েক বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন। তাহার পর, পিতা, খুল্লতাত, খুল্লতাত পত্নী, বালিকা পত্নী প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পৈতায় অঙ্গুলি জড়াইয়া ঈশ্বরের নাম

করিতে করিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। শৈলেশ চন্দ্র যে ধীরতা এবং বিবেক লইয়া জন্মিয়াছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তাহা হারান নাই। তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর ৩ মাস মাত্র হইয়াছিল। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের একদিকেও বৃথা অতিবাহিত হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় দেওঘরের আনন্দকাননে তাঁহার প্রিয়দর্শন পুত্রের দেহ ভস্মীভূত করিয়া শূন্য মনে গৃহে ফিরিলেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র উপাধ্যায়।

কায়স্থ-উদ্বোধন।

(প্রথম ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনে কলিকাতা টাউনহলে গীত)

৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১২ খ্রীঃ।

এস এস ভাই, স্বাগত
স্বজাতির মহামিলনে,
এস কায়স্থ-প্রতিনিধি যত
জাতীয়-ধর্ম্ম পালনে!
বিভেদে ভুলিনু মোরা ভাই ভাই,
নগ-নদী পারে হয়ে ঠাঁই ঠাঁই,
আজি শুভদিনে, শোণিতের টানে
টুটিল ভ্রান্তি নয়নে!
মোহের এ চির-বিরহের পরে,
নব অনুরাগ লয়ে অন্তরে,
এস ভাই, মেশো বক্ষে বক্ষে,
অটল-একতা-গঠনে!
অযুত প্রাণের যুক্ত শকতি,
তড়িৎ-প্রবাহে একমুখে গতি,
কঠিন আঁধার ঝটিতি বিদারি
পশিবে জ্যোতির ভুবনে।
গৌরব কিবা নবীন উষায়,
গোলাপি আলোক কিরীট-ভূষায়,
নব জাগরণে দূরিত তন্দ্রা
মহামন্ত্রের সাধনে।
"কায়স্থ-নাম চির-ভাস্বর
কর উজ্জ্বল, উজ্জ্বল-তর",—
দেববাণী নভে গভীর মন্দ্রে
ঘোষিছে, আশার বচনে!
এস গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী,
পদ্মা, মেঘনা, বাজাইয়া ভেরী,
এস নর্ম্মদা, এস মহানদী,
গঙ্গা ও নীল যমুনে,—
এস উচ্ছ্বাসে, মহাকল্লোলে;—
যুক্ত-বেণীতে বহিলে সকলে,
পার হিমাদ্রি উপাড়ি ফেলিতে
অতল-জলধি-শয়নে!

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

উভয় রামকৃষ্ণের তুলনা। (৩)

এই এক চরিতামৃত গ্রন্থেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমগ্র মত আশ্চর্য্য ভাবে বর্ণিত আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে ঈশ্বর ভজন দ্বিবিধ, বৈধ-ভজন ও রাগ-ভজন। নাম সঙ্কীর্ত্তন

বিষ্ণু পূজা প্রদক্ষিণাদি চতুঃষষ্টি-অঙ্গাত্মক বৈধ ভজনকে বৈধ বলে। এই ভজন অতীব প্রাচীন। এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন নাই।

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তার কাম।" (চৈ, চ)

(কাম=কামনা, বাঞ্ছা।)

তবে তাঁহার কাম কি?

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম।"
(চৈ, চ)

জীবগণ ব্রজের নির্ম্মল রাগাত্মিকা ভক্তি শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম অর্থাৎ বৈধ ভজন ত্যাগ করিয়া যেন রাগমার্গে কৃষ্ণ ভজন করে, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার অবতার।

বৈধ ভজন চতুঃষষ্টি-অঙ্গাত্মক বিষ্ণু পূজাদি ক্রমে ভজন করিলে দোষ কি? না—

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়া।"

যুগধর্ম্ম আচরণ ও বৈধ ভজন করিলে সালোক্যাদি চারি প্রকারের কোন এক প্রকার মুক্তি পাইয়া ভক্তজন বৈকুণ্ঠধামাভিমুখে চলিয়া যায়।

তাহাতে ক্ষতি কি? বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণলাভ কি যে সে কথা? উত্তর:—

"সকল জগৎ মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধি ভক্ত্যে ব্রজের ভাব পাইতে নাহি শক্তি।" (চৈ, চ।

কৃষ্ণ বলিতেছেন, জগতের লোক আমাকে বিধি ভক্তি করিয়া বৈকুণ্ঠে যায়, কিন্তু এই বিধি ভক্তি করিলে ব্রজের সখ্যাদি মধুময় ভাবে ভজন করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। বিধিভক্তি করিলে জীবগণ ব্রজে কৃষ্ণলাভ করিতে পারে না।

"বিধিমার্গে নাহি মিলে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র।"
(চৈ, চ।

অথচ ভক্তমাত্রেরই ইচ্ছা যে ব্রজে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়, বৈকুণ্ঠে নারায়ণ প্রাপ্তির ইচ্ছা অতি অল্প লোকের। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণব ভক্তসমাজ শেষোক্ত বাঞ্ছা আর অধিক করেন না। এখন চাই চিদানন্দ বিকার ব্রজের ধূলি, ও চিদানন্দময় গো, গোপ, বৃক্ষলতা-শোভিত ব্রজভূমি ও তাহাতে বাৎসল্যাদি ভাবময় ভজনের আরোধ্য নবজলধর রুচি চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণ। আর কিছু চাই না। এই অবস্থা এক রাগ ভজন ভিন্ন আর কোন সাধনায় দিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের প্রতি কৃপা করিয়া এই পরম অবস্থা জীবগণকে দান করিয়াছিলেন। জীবগণ সংসার-মায়ায় এই ভজনে অধিকারী হইতে পারিল না।

রাগভজন করিতে হইলে নিম্নলিখিত ধারণা একান্ত অপরিহার্য্য:—

কৃষ্ণই পরাৎপর পরমেশ্বর। তিনি অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ অন্য কেহই তাঁহার সমান নহে, তাঁহা হইতে বড় আর কেহ নাই।

কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহই জীবের উপাস্য হইতে পারে না। প্রত্যেক জীব স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন দেবতা জীবের প্রভু নহেন।

এই ধারণার নাম একনিষ্ঠতা। একনিষ্ঠতা যাঁহার জন্মে নাই, তাঁহার রাগভজন নাই।

নারায়ণ, সঙ্কর্ষণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবতা ও জীবমাত্র কৃষ্ণদাস। এক কৃষ্ণই প্রভু, আর সকলেই তাঁহার দাস।

কৃষ্ণের তিনটী স্বরূপ শক্তি আছে। সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ। মায়া নামে বহিরঙ্গ শক্তি আছে, সৃষ্টি-প্রবাহগত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই মায়ার বৈভব। জীব তটস্থ শক্তি। জীবের

সংখ্যা অনন্ত। ইহারা সকলেই কৃষ্ণদাস, মায়ার প্রভাবে জীব কৃষ্ণদাসত্ব ভুলিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করে। সাধু ও গুরু কৃপায় নিজের কৃষ্ণদাসত্ব স্মরণ হইলে নিজ প্রভুর ভজন করিবার জন্য ব্যগ্র হয়।

কৃষ্ণ নিয়ত বৃন্দাবনে বাস করেন। কৃষ্ণের সৎ-চিৎ-আনন্দ-ঘন বিগ্রহ আছে। বৃন্দাবনের সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়—চিদানন্দময়। এই ধামের বৈভব অনন্ত। ইহার ভূমি চিন্তামণি, বন কল্প বৃক্ষময়। এই বনে চিদানন্দময় গো, গোপ, গোপীগণ বাৎসল্যাদি ভাবে পরমানন্দ-ঘন ব্রহ্ম গোপাল কৃষ্ণের সেবা করেন। রাজভক্তিতে জীব এই বনে প্রবেশ করিতে পারে। এই বনে প্রবেশ পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ ঘন কৃষ্ণভজন করে; ইহা অপেক্ষা জীবের আর কোন উৎকৃষ্টতর অবস্থা নাই।

এই বৃন্দবান সৃষ্টি প্রবাহের বাহিরে। তাহার সৃষ্টি প্রবাহাদি নাই। কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে স্বরূপে বাস করেন। তিনি জলচন্দ্রবৎ অন্তর্যামী প্রভৃতি বিবিধ রূপে সৃষ্টি প্রবাহ-ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করেন। তাহা দ্বারাই সৃষ্টি প্রবাহ প্রাণযুক্ত হইয়া আনন্দ মাত্রা ভোগ করে।

কৃষ্ণ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য প্রভাবে ময়-বৃন্দাবন ও ময়-পরিকর পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হন। গত দ্বাপরান্তে কৃষ্ণময় পরিকর ও ময়-বৃন্দাবন মথুরা জেলার নিকটস্থ বৃন্দাবনে প্রকট হইয়াছিলেন। প্রকট হইয়া আবার অপ্রকট হইয়াছেন। অপ্রকট হইলে সপরিকর সবৃন্দাবন কৃষ্ণ স্থূল চক্ষুর অগোচর হন মাত্র, কিন্তু সেই প্রকট লীলাস্থলীতে স্বরূপে অবস্থান করেন। জীবগণ সাধন করিলে লীলাস্থলীতেই বৃন্দাবন ও সপরিকর কৃষ্ণ দর্শন করেন, সাধনান্তে লীলাস্থলীতেই অবস্থিত বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া সিদ্ধদেহে ভাবোচিত ভাবে কৃষ্ণ সেবা করেন ও কৃষ্ণসহ বিচরণ করেন। এই যে লীলাস্থলীতে অনুপ্রবেশ, "ইহা ব্রজে কৃষ্ণ প্রাপ্তি।" সিদ্ধদেহলাভের পরে জীব লীলাস্থলী ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করে না। পূর্ব্বোক্ত ভাবে লীলাস্থলীই নিত্য। অতএব

"এই বৃন্দাবন মোর ভজন সাধন।
এই বৃন্দাবনে মুঞি ত্যজিব জীবন।"

ইত্যাকার পরমানন্দময়ী অবস্থা প্রাপ্তির জন্য জীব রাগভজন করিবে।

"এই বাহ্য আগে কহ আর" এই প্রণালীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাসনা "হেয়" করিয়া পর উপাসনা "উপাদেয়" করিয়াছেন। যাহা পরমোপাদেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, *তাহাই রাগের বিষয়ীভূত জানিবে।*

সাধ্য ভেদে ভজন রাগও বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রবলতার তারতম্য বশতঃ নহে। বৈধ ভজনেও পর্য্যাপ্ত অনুরাগ থাকিতে পারে। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, উদ্ধব, অম্বরীষাদির ভজন বৈধ ভজন। উহাতে অনুরাগের কম নহে।

অম্বরীষের ভক্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"পক্ষপাতেন তন্নাম্নি মৃগে পক্ষে চ তাদৃশি।
তদ্ভাব মেঘে তদ্বর্ণে বহুমানমতিং নৃপ।"

(স্বপ্নেশ্বর ভাষ্যধৃত বচন)

শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ বশতঃ রাজা অম্বরীষ কৃষ্ণমৃগে, নীলপক্ষে, নীলবর্ণ মেঘে বহুমান প্রদর্শন করিতেন। অর্থাৎ এই সকল বস্তুতে কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপন হইয়াছিল।

রাগের পরমাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা অতি কঠিন। উহা দীর্ঘকাল আবশ্যক করে :—

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
(চৈ, চ)

ইহা রাগের উৎকণ্ঠা।

রাগভক্তির সামান্য লক্ষণ :—

"অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

এই ভজনে মোক্ষাদি বাঞ্ছা থাকিতে পারে না, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মে আবরণ সহ্য করিতে পারে না। ইহাতে অনুকূল চিত্ত কেবল কৃষ্ণানুশীলন থাকে। (১)

ব্রজপ্রাপ্তির পর এই মহারাগাত্মক নৈষ্কর্ম্ম্য ভজন বিক্ষিপ্ত-চিত্তে সাধকের অসাধ্য। ইহাতে জীব অর্দ্ধবাহ্য ও অন্তর্দ্দশার অনুলোম বিলোম গতি দ্বারা কেবলান্তর্দ্দশা বা প্রেমাবস্থায় পঁহুছিয়া ব্রজভূমিতে কৃষ্ণ লাভ করে। এই সকল ক্রিয়া, মুদ্র, বা অবস্থা অপ্রাকৃত। এই ভজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে জগতে কেহ জানিত না। এই জন্যই ভক্তিকে অনর্পিতচরী বলে। পূর্ব্বং ন অর্পিতা অনর্পিতচরী। ভূতপূর্ব্বে চরট্। (২)

ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব।
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।
(চৈ, চ)

এই ভজন মোক্ষবিদ্যা, জ্ঞানশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, কর্ম্মশাস্ত্রের স্পর্শও সহ্য করিতে পারে না। ইহা অতি সুকুমার এবং সন্তর্পণে রক্ষিতব্য।

(১) কৃষ্ণং স্মরণ্, সেবা সাধকরূপেণ ইত্যাদি প্রয়োগ শাস্ত্রে ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

(২) রহি বাঁশা বৈশিকরূপত্বং সিদ্ধ সাধক রূপয়োরিতি অনুবাদ বিধেয় বিচারেণ রূপস্য গোস্বামি মল্লর্য্যাদিভাববৎ যথাবস্থিতকায় বিস্মৃত্যাদি ভাবো অস্ত প্রবন্ধস্য বিষয় ইতি মন্তব্যম্।

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন :—

জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড সকলই বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া কেবা খায়,
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।

রাগভজন জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ক শাস্ত্রের গন্ধও সহ্য করিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোঁসাইতে আত্ম-সমর্পণ না করিলে এই পবতর ভজন ঘটে না।

রাগাচার্য্যগণ বলেন, রাগভজনে অগ্রসর হইয়া ভ্রষ্ট হইলেও জীবের কোন ভয় নাই। রাগভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মসাযুজ্য লোকে, কি ব্রহ্মলোকে পতিত হয়—ব্রজভূমি হইতে ভ্রষ্ট সাধনের যাহা পতন স্থান, তাহা অন্যান্য সাধনের দুর্ল্লভ বস্তু। এই সাধনের প্রধান অন্তরায় বহুদেবতা-নিষ্ঠা, কর্ম্মজ্ঞান ও যোগ প্রভৃতির অনুষ্ঠান।

জ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যে আবার শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ এই ভজনের ঘোর শত্রু। শঙ্করাচার্য্যে সত্তা, চেতনা ও আনন্দকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, শব্দ মাত্রই জাতি, অথবা জাতি-দ্রব্য ক্রিয়া ও গুণ বুঝায়। জাতি, দ্রব্য, ক্রিয়া ও গুণ ছাড়া আর কিছুই কোন শব্দের বাচ্য হয় না। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ব্রহ্ম অনেক নাই, কাজেই ব্রহ্মত্ব জাতি নহে; দ্রব্য, ক্রিয়া ও গুণ জড় মাত্রেই দেখা যায়। ব্রহ্ম মৃত্তিকাবৎ দ্রব্য নহেন; ক্রিয়াও নহেন, কেননা ব্রহ্মের কোন অবয়ব নাই, ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে বিদ্যমান থাকে। পাতঞ্জল ভাষ্যে লিখিত আছে—ক্রিয়াই পূর্ব্বাপরীভূতাবয়বা ন কেনচিৎ পিণ্ডীভূতা দর্শয়িতুংশক্যা। ব্রহ্ম গুরুত্বাদি গুণবৎ কিছু নহেন। কাজেই ব্রহ্ম-বস্তু কখনই শব্দের বাচ্যার্থ,

শাক্যার্থ বা মুখ্যার্থ হইতে পারে না। সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম, এরূপ বলা যায় না, কেন না সত্তা, চিৎ আনন্দ ব্রহ্ম হইলে ব্রহ্মবস্তু ঐ সকল শব্দের বাচ্যার্থ হইয়া দাঁড়ায়। সত্তা, চেতনা ও আনন্দ দ্বারা ব্রহ্ম উক্ত হন না, লক্ষিত হন মাত্র। বেদোক্ত শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম লক্ষ্য হন না, বাচ্য হন না। কাজেই সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্রহ্ম, এইটী ছেলে ভুলান কথা মাত্র। জড় বস্তু মাত্রের অস্তি, জায়তে, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, ক্ষীয়তে, নশ্যতি—এই ছয় প্রকার বিকার দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মে এই সকল বিকার নাই। কাজেই সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মনির্দ্দেশ করা ঠিক নহে। এই ভাবে ব্রহ্ম ইহা নয়, তাহা নয়, হা নয়, তা নয়, বলিতে বলিতে শঙ্করের ব্রহ্ম, বৌদ্ধের মহাশূন্য মধ্যে প্রায় পরিণত হন। এই জন্য বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন,—শঙ্কর "বেদান্তিক্রবঃ" নিজেকে বেদান্তী বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু বস্তুতঃ বেদান্তী নহেন, কিন্তু প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মাত্র।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিণা।"

শঙ্করের মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ নামক যে একটা অসৎ শাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছে, উহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত, যাহাতে জীব ঈশ্বর লাভ না করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আমি মহেশ্বরই ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিতে (শঙ্করাচার্য্য মূর্ত্তিতে) এই মত প্রচার করিয়াছি।।

চরিতামৃতে আছে :—

"বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক।"

শঙ্করাচার্য্য বেদবাদিতার অভিলাষ নাস্তিকমত প্রচার করিয়াছেন। এরূপ কার্য্য বৌদ্ধ হইতেও ঘৃণিত।

মহাপ্রভুর মত এই, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ তাঁহার নিজের একটা কষ্ট কল্পনা মাত্র। উহা বেদান্ত-সম্মত নহে। "এইরূপে কল্পনা-ভাষ্যে শত দোষ ছিল।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অদ্বৈতবাদ মতে ব্যবহারিক সংসারবৎ একটা ঈশ্বর ভজনের ব্যবস্থা আছে এবং উক্ত ভজন জীবের অজ্ঞান পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী। এইরূপ ঈশ্বর ভজন "সম্বাদী-ভ্রম" বিশেষ। যেমন অন্ধকার মধ্যে খদ্যোত পোকা ধরিবার জন্য দৌড়িয়া এক জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একটা প্রজ্বলিত প্রদীপ পাইলাম, তাহা দ্বারা পথ পাইলাম। এতন্মতে ভজনাদিমাত্রই মায়াগণ্ডীর অন্তর্গত ক্রিয়া। শঙ্করাচার্য্যের কোন কোন কথা ঈশ্বরভক্তির কথার ন্যায়। গীতাভাষ্যে ও সহস্র নাম ভাষ্যে তিনি ঈশ্বর ও ঈশ্বরভক্তির অনেক মিষ্ট কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই ভাব তাঁহার প্রভাবশালী অদ্বৈতবাদের অঙ্গ নহে, কুক্ষিগত বিষয় মাত্র। তাঁহার এই মায়াপণাতে অনেকে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আমাকে এক দিবস বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণাষ্টকের "সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীন ত্বম্। তবঙ্গো হি সামুদ্রঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তাবঙ্গঃ" এই অংশ ইহার প্রমাণ। উক্ত বচনের অর্থ এই :—"হে কৃষ্ণ, হে নাথ, জীব তোমা হইতে অভিন্ন, এই কথা বলিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে আমার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। জীব এবং ঈশ্বরগত ভেদ দূর হইয়া গেলেও আমি তোমার (অংশ), তুমি আমার নহ; তরঙ্গ সমুদ্রেরই বটে, সমুদ্র যে তরঙ্গের, এমন কথা কখনও শুনি নাই। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর হরিদাসের জীবনে

লিখিয়াছেন :—

"শঙ্করাচার্য্য অন্তরে অন্তরে কৃষ্ণকে ঈশ্বর মানিতেন"। প্রকৃত প্রস্তাবে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের চরম সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি করিলে, এ গুলি কিছুই নহে, ভাবুকতা প্রকাশ মাত্র। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব সাধকগণকে বার বার বলিয়া দিয়াছেন :—

"মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ"। শারীরক ভাষ্য কল্পনা মাত্র, উহা শ্রবণ করিলে জীবের পতন হয়। অদ্বৈতবাদ নির্ম্মল ঈশ্বর ভজনের অতীব প্রতিকূল। তবে কোন কোন অবান্তর বিষয়ে শঙ্কর ও মহাপ্রভুতে ঐক্য আছে। উভয় মতেই তত্ত্ব-চিন্তা, বিষয়বৈরাগ্য অপেক্ষা করে। উভয় মতেই কর্ম্ম কদাচ জ্ঞান বা ভক্তি দান করিতে পারে না। উভয় মতেই গৃহস্থাশ্রম, মোক্ষাশ্রম নহে, জীবগণ কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মের সাহায্যেই চিত্তশুদ্ধি, ক্রমে জ্ঞান বা ভক্তি লাভ করিবে—এ কথা উভয়েরই অগ্রাহ্য। কর্ম্মী জীব দৈবে মোক্ষশাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর কৃপা (১) লাভ করিলে দৈব মায়া অতিক্রম করিতে পারে। কর্ম্ম স্বয়ং, অথবা জ্ঞানের সহকারী হইয়া, কর্ম্মপাশ ছেদন করিতে পারে না। অন্ধকার আলোক দিতে পারে না। শাস্ত্র এবং গুরুবাক্য ভিন্ন কর্ম্মনাশ করিবার আর অস্ত্র নাই।

প্রযোগ সম্বন্ধেও উভয় মতে একটা সাদৃশ দেখা যায়। শঙ্করাচার্য্য বলেন, অনাদি অবিদ্যা প্রভাবে জীব নিত্য ব্রহ্ম হইয়াও নিজকে অজ্ঞান জীব বলিয়া অধ্যাস করে। এই দূর করিবার জন্য "আমি ব্রহ্ম জীব" এইরূপ একটা উল্টা ভাব সর্ব্বদা চিন্তা করা আবশ্যক। এইরূপ বিপরীত অধ্যাস দ্বারা জীব নিজকে কর্ত্তৃত্বাদি রহিত আত্মা বলিয়া ধারণা করিতে পারিলেই কর্ম্ম-নাশ হয়।

---

(১) উভয় রামকৃষ্ণ নিবৃত্তি মার্গের, জ্ঞানবৈরাগ্য মার্গের সাধু ছিলেন। কিন্তু পরমহংসের শিষ্য সম্প্রদায়স্থ স্বামী বিবেকানন্দ প্রবৃত্তি মার্গের অনুগত ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার কেন্দ্রস্থান ছিল ঘোর কর্ম্মপরতা। ব্রাহ্মণদিগকে প্রশান্ত সাগরে ফেলিয়া দিয়া এই দেশে একটা কর্ম্মনিষ্ঠ সংসার গঠন করা তাঁহার স্বপ্ন ছিল। এগুলি নিবৃত্তি-মার্গস্থ সাধুর কথা সদৃশ নহে—ঘোর কর্ম্মী সাধুর কথা। ইনি কিরূপে যে নিবৃত্তিমার্গগামী সাধু পরমহংসের ছায়ায় দাঁড়াইলেন, বুঝা কষ্টকর। ইঁহার মতের সঙ্গে সুপণ্ডিত তিলক প্রভৃতি কর্ম্মী মনুষ্যের সাদৃশ্যই অধিক। এই কর্ম্মপরতার ভাব কি শঙ্করাচার্য্য, কি তদীয় নিবৃত্তিমার্গবাদী কোন সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নহে।

শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন,—সেই ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের হিতের জন্য মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি দ্বারা প্রবৃত্তি ধর্ম্ম কর্ম্মপথ বিস্তার করিলেন। যাঁহারা প্রবৃত্তি ধর্ম্মে অনুরক্ত নহে, ইত্যাকার জীবের জন্য সনক ও সনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ দ্বারা জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণক নিবৃত্তি ধর্ম্মের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন (সংশ্লবান্..... গ্রাহয়ামাস। ইতি)। এইরূপে কর্ম্মী ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুরু সম্প্রদায় আছেন। জ্ঞানী কর্ম্মোপদেশ করেন না, কর্ম্মী জ্ঞানোপদেশ করেন না। যিনি যাহা উপদেশ করেন আশা করা যায়, তিনি নিজে তাহা করিয়া শিষ্যগণকে দেখাইবেন। যিনি কর্ম্মপর সংসার সৃষ্টির পরামর্শ দেন, তিনি অবশ্য কর্ম্মের গুরু হইবার যোগ্য। বিবেকানন্দ স্বামীকে এই ভাবে প্রবৃত্তিমার্গগামী বলিয়া দেখিতে পাই। যত দূর বুঝিতে পারি, চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন কখন জ্ঞান জন্মে না, কর্ম্ম না করিলে যখন চিত্ত শুদ্ধি হয় না, তখন জ্ঞান লাভের জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের মত বলিয়া বুঝা যায়। সাধারণের বিশ্বাস, স্বামীজী অদ্বৈত বেদান্তবাদী ছিলেন। বেদান্ত ধর্ম্ম গৃহস্থের নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম, যে আশ্রমে এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম প্রব্রজ্যা সমাজ বা ভিক্ষু আশ্রম। বেদান্ত সূত্রের এক নাম ভিক্ষু সূত্র। ব্রহ্ম

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতেও জীব কৃষ্ণের বহিরঙ্গ মায়া শক্তির প্রভাবে নিজেকে জীব বলিয়া ভাবে, নিজে যে শুদ্ধ "কৃষ্ণদাস", তাহা ভুলিয়া থাকে। এই ভ্রম দূর করিবার জন্য আমি জীব নহি "কৃষ্ণদাস", এইরূপ আরোপ করিতে হয়, ইহা রাগভজনের একটী

সূত্রের যতরূপ ভাষ্য আছে সেই সকলগুলি ভাষ্যই সেই সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের নিত্য পাঠ গ্রন্থ। উহা দ্বারা কর্ম্মনিষ্ঠা জন্মে বা কর্ম্মত্যাগ জন্মে। স্বামীজীর কথার ভাবে বুঝায়, বেদান্ত-সূত্র ভাষ্যাদি গৃহস্থের ধর্ম্ম গ্রন্থ। উহাদের সাহায্যে কর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া যায়।

শঙ্করাচার্য্য কর্ম্ম ও জ্ঞান বিষয়ক মীমাংসাগুলি গীতাভাষ্যে যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লিখিয়াছেন, এমন কি, ছান্দোগ্যভাষ্যেও সেরূপ স্পষ্ট করিয়া লিখেন নাই। এই ভাষ্যের সিদ্ধান্তে দেখিতে পাই, ক্রিয়া-কারক ফলভেদ-বুদ্ধি-মূলক অনিত্য কর্ম্ম কখনও নিত্য জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না।

"অকার্য্যত্বাৎ নিঃশ্রেয়সস্য কর্ম্ম সাধনাত্মানুপপত্তিঃ।

(গীঃ ১৮।৩৭ ভাষ্যম)

মোক্ষের নাম জ্ঞান ঘটাদিবৎ অনিত্য কার্য্য নহে, কর্ম্ম কখনও উহার সাধন বা উপায় হইতে পারে না।

'লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ (কর্ম্ম) অবিদ্যা কার্য্যত্বাৎ অবিদ্যা নিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে, অবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যা বিরোধাৎ নিবৃত্তিঃ। ঐ

লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার মাত্রেই অবিদ্যার সিকার বিশেষ, অবিদ্যার (অজ্ঞান) নিবৃত্তি হইলে ব্যবহারের নিবৃত্তি হয়। বিদ্যার দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। কর্ম্ম রূপ অবিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা দূর হয় না। ভাষ্যকার সমুচ্চয়বাদ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন:—

"ন জ্ঞাননিষ্ঠা কর্ম্মসহিতা উপপদ্যতে। নাপি জ্ঞানস্য কর্ম্ম সাহায্যাপেক্ষা।" (ঐ ভাষ্য)

জ্ঞাননিষ্ঠা কখনও কর্ম্মের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না। জ্ঞান কখন কর্ম্মের সহায়তার অপেক্ষা করে না।

"তস্মাৎ আত্মজ্ঞানবতঃ সন্ন্যাসে ক্রমোধিকারো ন কর্ম্মণি।" (গীঃ ২।২১ ভাষ্য)

অতএব আত্মজ্ঞান পথের পথিকের সন্ন্যাসেই অধিকার কর্ম্মে অধিকার নাই।

"যাবদ্ যাবৎ কর্ম্মভ্য উপরমতে তাবৎ তাবৎ চিত্তং সমাধীয়তে তথা সতি স কচিতি যোগারূঢ়ো (জ্ঞানী) ভবতি। (গীতঃ ৬।৩ ভাষ্য)

জ্ঞান-নিষ্ঠার প্রাথমিক পথিক যতটুকু করিয়া কর্ম্ম-

ত্যাগ করে, ততটুকু তাহার চিত্ত সমাহিত হয়। এইরূপ করিতে থাকিলে সত্বর সে জ্ঞানী হইয়া উঠে।

আমি অকর্ত্তা, এই ভাব জ্ঞানের উৎপাদক, আমি কর্ত্তা, আমার ক্রিয়া আছে, ইত্যাকার ক্রিয়া, কারক ও ফলভেদ বুদ্ধি হইতে কর্ম্ম জন্মে। দুইটী ভাবই পরস্পর বিরুদ্ধ, কাজেই কর্ম্ম জ্ঞানের শত্রু ভিন্ন মিত্র নহে।

কর্ম্মীগণ জনক ও শ্রীকৃষ্ণকে দৃষ্টান্ত স্থলে আনয়ন করিয়া তর্ক করেন, ইঁহারা জ্ঞানী হইয়াও কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব জ্ঞানী হইলেও কর্ম্ম নিবৃত্তি হয় না, কর্ম্ম ও জ্ঞান যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই কথার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—সমুচ্চয়বাদী কর্ম্মী কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝে না। যে ব্যক্তির "আমি অমুক জাতীয়, অমুক গোত্রীয়, অমুক সঙ্কল্পে এই কর্ম্ম করিতেছি এইরূপ অহঙ্কার ও আসক্তি থাকে, সেই ব্যক্তি কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ফল জন্মে, অদৃষ্ট জন্মে, সেই ব্যক্তিরই কর্ম্ম কর্ম্ম হয়। যাহার অহঙ্কার, ক্রিয়া কারক ফলভেদ-বুদ্ধি নাই, তাহার অনুষ্ঠান কর্ম্ম হয় না। এমন কি, যদি কোন ব্যক্তি একটা কাম্য যজ্ঞাদি আরম্ভ করে এবং সেই যজ্ঞের অর্দ্ধেক শেষ হইবার পরেই তাহার জ্ঞান জন্মে, তবে দেহ স্বভাবে সেই যজ্ঞাদি সমাপ্ত হইলে উহা কাম্য কর্ম্ম হয় না, ফল প্রসব করে না। তদ্রূপ স্থলে নিত্য বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ভগবান্ কৃষ্ণের অনুষ্ঠান কিরূপে কর্ম্ম হইবে? তাঁহার কর্ম্ম কর্ম্ম নহে, কাজেই উহা জ্ঞানের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, এরূপও বলা যায় না। জনক ও অশ্বপতি প্রভৃতির কথা অন্য প্রকারের। ভাষ্যকার ইঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, যদি এই সকল ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার কর, তবে ইঁহাদের কর্ম্মও পূর্ব্ব যুক্তিতে কর্ম্ম ছিল না। আর যদি মনে কর, ইঁহারা জ্ঞানী ছিলেন না, অকৃতার্থ ছিলেন, তবে তাঁহাদের কর্ম্ম করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।

"জনকাশ্বপতি প্রভৃতয়ঃ যদি প্রাপ্ত সম্যগ্ দর্শনাঃ, ততো লোক সংগ্রহার্থং অসন্ন্যস্ত এব কর্ম্ম সংসিদ্ধিং আস্থিতাঃ। অথ (যদি) অপ্রাপ্ত সম্যগ্ দর্শনাঃ জনকাদয়ঃ তদা কর্ম্মণা সত্ত্বশুদ্ধি সাধন ভূতেন জ্ঞানেন

প্রধান অঙ্গ। রাগভক্তিতে প্রাথমিক অবস্থায় আমি কাহারও পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, সজাতি, সগোত্র নহি, আমি গুরুর শিষ্য মাত্র, এই আকারের স্থূল আরোপাবস্থা চাই। অতএব প্রতি অধ্যাস বা আরোপাংশে, বৈরাগ্য, নিষ্কর্ম্ম্য, শাস্ত্রভক্তি এবং গুরুভক্তি উভয়মতে তুল্য ভাবেই প্রবল।

শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতজ্ঞানবাদের ছায়া-ভুক্ত যত গুলি মত আছে, সকল গুলিতেই শাঙ্কর জ্ঞান ও ঈশ্বর ভক্তির অবস্থা বিদ্যমান আছে। এই সকল মতের বাহ্য লক্ষণ এই যে, এক দিকে যেমন নিরঞ্জন ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই, সেইরূপ, ইঁহাদের ঈশ্বরের পার নাই; ইঁহারা একনিষ্ঠ নহেন। ইঁহারা যুগপৎ শিব, শিবাণী, রাম, বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি ভজন করিতে পারেন ও করেন। ইঁহারা সেই ভাবে আজ রাম, কাল কৃষ্ণ, পরশ্ব কালী সাধন করিতে পারেন। ইঁহাদের ভজনের এই ভাবটীও অদ্বৈতবাদের অনুগত। যাঁহাকে বিশেষ সম্প্রদায় একেশ্বর ভজন বা একনিষ্ঠতা বলেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে একনিষ্ঠতা সহকারে নিত্য ব্রজভূমিতে কৃষ্ণ লাভ রূপ চরমাবস্থার কাছে, উক্ত প্রকারের বহু সিদ্ধি প্রাপ্তি প্রভৃতি কিছুই নহে। ইহাতেই এক রূপ সমস্ত কথা বলা হইল। উভয় রামকৃষ্ণের মতে যে কিছু প্রভেদ আছে, তাহা জগমোহন ভাগবত ও রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী হইতে বারান্তরে দেখাইব।

শ্রীবসন্তকুমার রায়।

সংদিগ্ধং আশ্বিতা ইতি ব্যাখ্যেয়ং শ্লোকঃ। মন্যতে (যদি মন্যসে) পূর্ব্বরূপি জনকাদিভিঃ অজ্ঞানদৃভিঃ এব (অজ্ঞৈঃ এব) কর্ত্তব্যং (অনুষ্ঠেয়ং) কৃতং কর্ম্ম, তাবতা (এতয়া যুক্ত্যা) নাবজ্ঞং অজ্ঞেন কর্ত্তব্যং কর্ম্ম সম্যগ্ দর্শনবতা কৃতার্থেন ইতি" (৩।২০ ভাষ্য। ২।১১ ভাষ্য) অর্থাৎ জ্ঞানহীন অকৃতার্থ জনক রাজা কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই যুক্তিতে সম্যগ্ জ্ঞান সম্পন্ন কৃতার্থ ব্যক্তিকে কর্ম্মে ফেলিয়া দিতে পার না। মহাভারতের সুলভা-জনক-সংবাদে প্রতিবাদিত জনক রাজা অকৃতার্থ ছিলেন, গৃহী ব্যক্তি জ্ঞানী হইতে পারে না।

এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, পূর্ণ জ্ঞানী ব্যক্তি সম্বন্ধেই এই কথা, ঈষজ্ জ্ঞান সম্বন্ধে এই কথা খাটে না; কারণ জ্ঞানের স্বভাব পরিপক্কাবস্থায় যেরূপ থাকে, অপরিপক্কাবস্থায়ও ঠিক সেই রূপই থাকে, অর্থাৎ উভয় অবস্থায়ই জ্ঞান কর্ম্মবিরোধী থাকে। জ্ঞান কর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায়ই শত্রু মনে করে। এই জন্য প্রারম্ভ অবস্থায় কর্ম্ম যতটুকু ত্যাগ হয়, জ্ঞান ততটুকু প্রবল হয়।

যাবদ্ কর্ম্মভ্য উপরমতে, তাবৎ তাবৎ চিত্তং সমাধীয়তে, তথা সতি স ঝটিতি যোগারূঢ়ঃ (জ্ঞানী) ভবতি। (গীঃ ৩।৩ ভাষ্য)

কিছুমাত্র জ্ঞান জন্মিলেই নিবৃত্তিমার্গের গুরুগণের শরণাপন্ন হইবে; তাহাদের উপদেশে "আমি জীব নহি, আত্মা" এইভাবে সুপ্রণালী দৃষ্টে দিবারাত্রি অভ্যাস করণের চেষ্টা করিবে—কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মের অকিঞ্চিৎকরত্ব বিষয়ক ভাষ্যাদি শ্রবণ করিবে, ভিক্ষুগণের অনুগত হইবে, অহরহঃ কর্ম্মের অকিঞ্চিৎকরত্ব চিন্তা করিবে। এই ভাবে ঈষজ্জ্ঞানী ব্যক্তি ঝটিতি কৃতার্থ হইবে। কর্ম্ম ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া জ্ঞান জন্মাইবে, এই ভরসায় ঘোর কর্ম্মপর হওয়া কখনও ভিক্ষুদিগের উপদেশ হইতে পারে না। ঈষন্মুকুলিত-জ্ঞান জীবগণকে কর্ম্মমোহ হইতে টানিয়া লইয়া নিজ সম্প্রদায়োচিত প্রণালীতে কর্ম্মত্যাগ করাইবার জন্যই পরমহংস পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। ইহারা চিকিৎসক, রোগীকে স্বভাবের উপর রাখিয়া দেওয়া ইঁহাদের কার্য্য নহে। পরম হংস এই নিবৃত্তি ধর্ম্মাত্মক সম্প্রদায়ের একজন সাধক ছিলেন—তাহার সমগ্র কথাই ইহার প্রমাণ। বাগ্মী বিবেকানন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন কি না, ঘোর সন্দেহ। তদীয় সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা এই ভাবে ভাবিত, কর্ম্মময় লৌহদণ্ড হস্তে কেবল "বহুকার্য্য সাধনের" জন্য ব্রতী, তাঁহাদিগকে নিবৃত্তিধর্ম্মপর রামকৃষ্ণের সম্প্রদায়ী লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস করি না।

কেশব ও রামকৃষ্ণ।

প্রতিবাদ। (১)

পৌষ মাসের নব্যভারতে "কেশব ও রামকৃষ্ণ" পড়িয়া যে কয়েকটী কথা মনে জাগিল, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর বাবু রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র, উভয়কে তুলনা করিয়া রামকৃষ্ণকে নামাইয়া কেশব বাবুকে উচ্চে তুলিতে চাহিয়াছেন। এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণের ভক্তবৃন্দকে অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, কাণ্ডজ্ঞানহীন, চরিত্রহীন, ও সকল সমাজে স্থান পাইবার অযোগ্য, হিংসুক বলিয়া গাল দিয়া মনের ঝাল মিটাইয়াছেন।

আবার লিখিয়াছেন "রামকৃষ্ণ অশিক্ষিত এবং অনেক আবল তাবল বলিতেন।' তাহাত বলিবেনই, সকলেত তাঁহাকে পাগল বলিয়াই জানিত। কিন্তু বলিতে পারেন কি মহাশয়, তবে কেন সকলে ঐ অশিক্ষিতের পদধূলি মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইতে ব্যস্ত থাকিত? আর বলুন দেখি, ঐ আবল তাবল কথার মধ্যে এমন কি শক্তি ছিল, যাহা শুনিবার জন্য, কেশব প্রভৃতি মহাব্রাহ্মণ বিনীত শিষ্যের মত তাঁহার চরণ মূলে উপস্থিত হইত? প্যারীশঙ্কর বাবু লিখিয়াছেন, "রামকৃষ্ণ কতকগুলি অশিক্ষিত লোকের তাক্ লাগাইবার জন্য আসিয়াছিলেন।" অশিক্ষিত লোক, যথা—কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, মহেন্দ্রসরকার, বিদ্যাসাগর, নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, ভগ্নী নিবেদিতা প্রভৃতি ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী শিষ্যবৃন্দ। (গিরিশঘোষ প্রভৃতি পাষণ্ডের (?) নাম উচ্চারণে পাপ আছে বলিয়া সাহস করিলাম না।) তবে শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, শিক্ষিত কে?

প্যারীশঙ্কর বাবুর কথায় মনে হয়, রামকৃষ্ণ যেন লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বাজীকরের মত সকলকে অবাক্ করিতেন। তাঁহার আর কাজ ছিল না, অশিক্ষিতের তাক লাগান ছাড়া আর কি বৈজ্ঞানিক কাজ থাকিতে পারে?

নরপূজা বা অবতার-বিরোধী প্যারীশঙ্কর বাবুর মতে কেশবচন্দ্র সেন কেন আসিয়াছিলেন? "না, পরিত্রাণায় সাধুনাং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়।" অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া দেখিলে তিনি প্রকারান্তরে কেশব বাবুকে অবতারই বলিয়াছেন। আর তাঁর মতে রামকৃষ্ণ কেন আসিয়াছিলেন? না "নিজের জন্য, জগতের জন্য নয়"। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি একথা কি সত্য? রামকৃষ্ণের কার্য্য কি তাহাই প্রমাণ করে?

কথাগুলি তিক্ত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু প্যারীশঙ্করবাবু যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহারই উত্তর দিতেছি, নিজে কোন নূতন কথা বলিতেছি না। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিতেছি বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি কেশবচন্দ্রকে নিন্দা করিবার জন্য প্রবন্ধ

লিখিতে বসিয়াছি। কাহারও নিন্দা বা বন্দনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেশব-চন্দ্রের প্রতি আমি অশ্রদ্ধাবান নহি। তবে প্যারীশঙ্কর বাবু অনর্থক কতকগুলি লোককে গালি দিয়াছেন, তাহারই প্রতিবাদ-স্পৃহা আমার লেখনীকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

তিনি রামকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, অশিক্ষিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই অশিক্ষিতের কোন্ মন্ত্র শক্তি বলে উচ্ছৃঙ্খল—যাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ বাঁধিতে পারে নাই—সেই নরেন রামকৃষ্ণের সাধের নারায়ণ—মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিল? কি মন্ত্র-বলে গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ? প্যারীশঙ্করবাবু কি বলিতে চাহেন, এসব মিথ্যা কল্পনা?

স্বীকার করি, হিন্দুর জন্য পাদরীর সহিত কেশব বাবুর যুদ্ধ অনন্যসাধারণ। এবং তজ্জন্য হিন্দু জাতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহাও কি প্রকাশ করা উচিত নয়, যে, আরও অনেক মনস্বীর চিন্তাস্রোত সেই দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল? হিন্দু যাহাতে খ্রীষ্টান না হয়, সেজন্য আর যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেশব বাবুর সঙ্গে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলে সুখের বিষয় হইত নাকি?

আর একটী কথা, যে জাতিকে জগতে সকলেই তাচ্ছিল্য করিত, কে সেই জাতিকে এবং তাহাদের ধর্ম্মকে তাচ্ছিল্যের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছে? কেশব না রামকৃষ্ণ? কাহার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত? ভগ্নী নিবেদিতা, স্বামী গুরুদাস প্রভৃতি কি মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ধন-মান-ঐশ্বর্য্য, আত্মীয় বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া দীন হীনের মত এই হিন্দুস্থানে আসিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ও করিতে-ছেন? তজ্জন্য যদি কাহাকেও ধন্যবাদ দিতে হয়, তবে মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, তিনি রামকৃষ্ণ এবং তাঁহারই ভক্তগণ।

ধর্ম্ম সমন্বয়ের জন্য যদি কাহাকেও ভক্তি করিতে হয়, তবে তিনি 'রামকৃষ্ণ'! জানিনা আর কোন মহাত্মার ভিতরে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির ত্রিধারা একত্রে মিশিয়াছে? এহেন রাম-কৃষ্ণকে দেবতার মত ভক্তি করা কি তাঁহার শিষ্যবৃন্দের অন্যায় হইয়াছিল?

সকল সমাজেই ভাল মন্দ, দুইপ্রকারের লোক আছে। সংসারে সকলেই যদি ধর্ম্মপথে চলিত, তবে পৃথিবী স্বর্গ হইত। এক সম-াজের একজন অন্যায় করিলে যদি ঘৃণা বলিয়া সে সমাজ পরিত্যাগ করিতে হয়, তবেত সর্ব্বাগ্রে মনুষ্য সমাজ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ-কল্প হইয়া পড়ে। প্যারীশঙ্কর বাবু লিখিয়া-ছেন "পূর্ব্বে সন্ন্যাসিগণ আমাদের দেশে কাপালিক রূপে, চোর দস্যু, তস্কর ও বিপ্লব-বাদী রূপে বিরাজ করিত।" তিনি কি বলিতে চাহেন যে, তখনকার সব সন্ন্যাসীই চোর দস্যু ছিল? এবং তিনি বগুড়ার যে গুরুর কথা বলিয়াছেন—তাহা ভদ্রলোকের অপাঠ্য। তাহা লিখিয়া অশ্লীলতার নজির না দেখাইলে সুখী হইতাম। সব সমাজেই অনুসন্ধান করিলে ভাল মন্দ সকল রকমের লোক পাওয়া যায়। কোন সন্ন্যাসী ব্যভিচার করিল, কোন মঙ্ক কি নান পাপাচরণ করিল, বলিয়া সমস্ত সন্ন্যাসী কিম্বা মঙ্ক নানগণের প্রতি দোষারোপ করা পাপের কার্য্য বলিয়া মনে করি। সময় সময় অশিক্ষিত বৈষ্ণবের মুখেও এমন ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা শুনা-যায়, যাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সর্ব্বশেষে প্যারীশঙ্কর বাবুর প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, তিনি যেন ব্রাহ্ম সমাজকে

সমর্থন করিতে গিয়া অনর্থক সম্প্রদায়বিশেষকে আক্রমণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতি সাধন না করেন। খ্রীষ্টান পাদরীগণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি আমাদের যে বিদ্বেষভাব জাগাইয়াছেন, প্যারীশঙ্কর বাবুর চেষ্টা তাহার অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। সত্যই ঘরিবাবু শ্রীযুক্ত অজিত-কুমার চক্রবর্ত্তী-প্রণীত "খ্রীষ্ট" পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"আমরা তাঁহাকে (যীশুকে) হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খ্রীষ্টের পরিচয় সাধারণতঃ মিসনরীদের নিকট হইতে। খ্রীষ্টকে তাঁহারা খ্রীষ্টানি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম-সংস্কারকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খ্রীষ্টানকেও আঘাত করিতে গিয়া খ্রীষ্টকেও আঘাত করিয়াছি।"

ইহার পর আমাদের আর বক্তব্য থাকিতে পারে না। আমাদের সকলেরই জানা উচিত, সবধর্ম্মেই ঈশ্বর আছেন এবং সবধর্ম্মেই ঈশ্বর পাওয়া যায়। বেদ বাইবেল, কোরাণ পুরাণ সেই একেরই পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন।:

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

আমরা অনর্থক বৃথা দ্বন্দ্বে সময় নষ্ট না করিয়া যদি ভ্রাতৃভাবে সেই পরম মঙ্গলময়ের পথে চলিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা ইহ পরকালে শান্তি-রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব। সকলেরই মনে করা উচিত, বৃথাদ্বন্দ্ব আত্মহত্যার সমান।

এই প্রতিবাদে আমি যদি কাহারও নিকট অপরাধী হইয়া থাকি, তবে করজোড়ে তাঁহাদের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী।

ঐ প্রতিবাদ। (২)

আপনার নব্যভারতের পৌষ মাসের পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত মহাশয় লিখিত "কেশব ও রামকৃষ্ণ" নামক প্রবন্ধে রামকৃষ্ণ-দেব ও তাঁহার সন্ন্যাসী ভক্তদিগের সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। কারণ প্যারী বাবু মহা ভ্রমে পতিত আছেন, দেখিতে পাইতেছি। আমার জীবনে যাহা দেখিয়াছি, তাহা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে প্যারী বাবুর ভ্রম দূর হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনাকে এই পত্র পাঠাইতেছি। আমি ১৮৭৮ খ্রীঃ মেডিকাল কলেজ হইতে এল-এম-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিম প্রদেশে কোম্পানির চাকুরি করি ও ৫ বৎসর হইল পেন্‌সন্ লইয়া কাশীতে চিকিৎসা করিতেছি। ৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি শ্রীরামকৃষ্ণ দেব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতাম না এবং তাঁহার সন্ন্যাসী চেলাদের সহিত কখন মিশি নাই, বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করি নাই বলিলেই হয়। আমি পশ্চিমেই ছিলাম ও আমার কার্য্য লইয়াই ব্যাপৃত ছিলাম। পেন্‌সন লইবার ৩ মাস গত হয় নাই, একদিন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর আমি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে চিদাকাশে দর্শন করিলাম। সেই মূর্ত্তি, তবে গাত্র জ্যোতির্ম্ময় নীলাভ ও হস্তে স্বর্ণ মুরলী ও তাঁহার সম্মুখে শ্রীমতী রাধা

মহারাণী। আমি শাক্ত, কখন রাধাকৃষ্ণের ভাবনা করি নাই। সেই সময়ে একটী আকাশ বাণী আমার শ্রুতিগোচর হইল, তাহা এই—"ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁহার কৃপায় এই দর্শন হইল।" শ্রীরামকৃষ্ণ দেব যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-অবতার হইয়া আসিয়াছিলেন, এই বিশ্বাসের ভিত্তি এই দর্শন। আমি পূজা আরম্ভ করায় আমার স্ত্রী বড়ই বিরক্ত হয় ও রামকৃষ্ণ দেবের ছবি ভাঙ্গিয়া দিবে বলে। সেই রাত্রের শেষে জাগ্রত অবস্থায় আমার পত্নীকেও তিনি দর্শন দেন। তদবধি সেও আমার ন্যায় তাঁহার পূজা করিতেছে ও আমার পূজার সহায়তা করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অনেক গৃহস্থ ভক্ত আছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য। তাঁহারা আমার ন্যায় দর্শন লাভ করিয়া তবে তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, ইহা আমি তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি। আমরা সকলেই গৃহস্থ; স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া সংসার করিতেছি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে ঈশ্বর অবতার বলিয়া জানিয়াছি। তিনি স্বয়ং জানাইয়া না দিলে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারেনা, বা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে না। যদি বলেন যে, আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া কি লাভ হইয়াছে? সেই দর্শন পাইবার সহিতই, একটী জ্যোতির্ম্ময় পথ খুলিয়া গিয়াছে, যাহাতে যোগীরা সুষুম্না মার্গ বলে। সেই পথ প্রাপ্ত হইলে হৃদয়ে আনন্দের উল্লাস জন্মে, মৃত্যুভয় থাকে না, ও সর্ব্বদা ইষ্টদেবের সহাস্য মূর্ত্তি দর্শন হয়। আবশ্যক হইলে মনে কোন সংশয় উদয় হইলে তাহা ভগবান স্বয়ং নিরাকরণ করিয়া দেন। আমার যাহা ধারণা, তাহা আপনার পাঠকগণের গোচর করিলাম, ভরসা করি, তাঁহারা ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবেন। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মধুসূদনের অমরত্ব।

উৎপত্তি—১২৫৯ সাল, মাঘী-শ্রীপঞ্চমী।
অনুস্থিতি—১৩ই পৌষ, শনিবার, ১৩১৯।

আমরা মহাত্মা ঈশা মুশা, নানক কবীর, বুদ্ধ মহম্মদ, হাসন হোসেন, চৈতন্য নিত্যানন্দকে দেখি নাই, কিন্তু এমন একজন লোক দেখিয়াছি, যাঁহাতে ঈশার নির্ভর, মুশার নিষ্ঠা, বুদ্ধের নির্ব্বাণ, মহম্মদের বিশ্বাস, হাসন হোসেনের আত্মত্যাগ, চৈতন্য নিত্যানন্দের প্রেম ভক্তি, এবং নানক কবীরের অকৈতব অনুরাগ জীবন্ত-ভাবে প্রদীপ্তি পাইয়াছিল। তিনি মহারাষ্ট্র, উৎকল এবং বঙ্গকে এক প্রেম-সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য দেহধারী হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের অপরাজেয়ত্ব, স্বভাবের মাধুর্য্য, বিশ্বাসের নির্ম্মাল্য, নিষ্ঠার অকৈতবতা, জ্ঞানের অহংশূন্যতা, প্রেমের পূততা যত ভাবি, ততই হৃদয় মন স্বর্গের দিকে উন্মুখীন হয়, আমরা মর্ত্ত্যবাসী হইয়াও যেন দেবত্বের আভাস প্রাপ্ত হই। সে ত মানুষ নয়, সে যেন ঘনীভূত একটা আলোর স্তম্ভ, যেন সৎ-চিৎ-আনন্দের একটা উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ। ষ্টার-অব-উৎকল বলেন, স্বপ্নাদেশে ২৮শে ডিসেম্বর (১৯১২) তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন;

আমরা বলি, তাঁহার জীবন খানিকে তদীয় পরিবারে—স্ত্রী-কন্যা-পুত্রে, ভ্রাতা-ভগ্নী-মিত্রে, সমগ্র উৎকলে, উৎকল হইতে বঙ্গে ঢালিয়া দিয়া মিশিয়া গিয়াছেন, কেননা, তাঁহার আর পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই। তিনি এক ছিলেন, এখন শতধা হইয়াছেন,—এখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বাস-অণুপরমাণুতে অনুস্যূত হইয়াছেন। তিনি আসিয়াছিলেন—তিনি ছিলেন, তিনি আছেন। তাঁহাকে দেখিতে চাও যদি, কটকের বাও-পরিবারে, উৎকল এবং বঙ্গের বিশ্বমানবত্বে অনুসন্ধান কর। যতদিন বিশ্বাস ভক্তি ও নির্ম্মল চরিত্র অমর, ততদিন তিনিও অমর।

সূক্ষ্ম তাঁহার দেহ, জীর্ণ তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ক্ষুদ্র তাঁহার মস্তক, দেহধারী হইয়াও পাশব-বলের সাক্ষ্য দিবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন না, সুতরাং এখন আর তাহা নাই। শরীর তাঁহার ছিল, কি ছিল না, সময়ে সময়ে সন্দেহ হইত। আহার সামান্য, যেন পক্ষীর আহার, বেশভূষা সামান্য, যেন ভিখারীর পরিচ্ছদ, গাড়ী ছিল না, ঘোড়া ছিল না – বড় মানুষের আসবাব কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহার মধ্যে তাঁহার যে অমর আত্মার চরিত্র বাস করিত, তাহা মহান হইতেও মহান, আজ কত কত রাজা মহারাজা সসম্ভ্রমে তাহা স্মরণ করিতেছে, তাহা বরণ করিতেছে, তাহা অনুকরণ করিতেছে, তাহা অনুসরণ করিতেছে। তিনি গৈরিক-তিলকধারী না হইয়াও মহা বৈরাগী, তিনি কর্ম্মযোগ সাধনের জন্য সংসারে থাকিয়াও মহাসন্ন্যাসী ছিলেন। সে এক দিগ্বিজয়ী শক্তি অজেয় জগৎকে জয় করিতে আসিয়াছিল, জগৎকে জয় করিয়া বিশ্ব-মানবত্বে তাহা পরিণত। ধন্য জীবন, ধন্য কৃতি, ধন্য ধৃতি।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, বড় বেশী বেশী বলা হইতেছে। তাঁহার কি দোষ ত্রুটী ছিল না? ছিল বই কি? কোন্ মহাপুরুষের দোষ ত্রুটী নাই। কিন্তু তাঁহার গুণ অসামান্য ছিল, সব দোষ তাহাতে ক্ষালিত হইয়াছে। তিনি যাহা ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে পারি, এমন ভাষা নাই, কৃতীত্ব নাই, শিল্প-নৈপুণ্য নাই; বেশী আর কি লিখিব? জগতে কোন কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, শুধু কাজের বর্ণনায় তাঁহাদের প্রকৃত গুণ ব্যাখ্যাত হয় না। ঈশা মুশা, বুদ্ধ মহম্মদ, চৈতন্য নিত্যানন্দ কাজের দ্বারা এজগতে ব্যাখ্যাত, বিখ্যাত এবং অমর নহেন। তাঁহারা প্রকট দেবলীলা, তাহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব, তাহাতেই তাঁহারা অমর। মধুসূদন এমন কি কাজ করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা তিনি অমর হইবেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য এলে-পরীক্ষোত্তীর্ণ,—১৯ বৎসর বয়সে অকিঞ্চিৎকর শিক্ষকতায় নিযুক্ত,—খাটিতে খাটিতে, যাইতে যাইতে শেষে ইনস্পেক্টরী পাইলেন, শেষে রায়-বাহাদুরী পাইলেন, ইহাই কি তাঁহার বিশেষত্ব? হায় রায়-বাহাদুরী, তাহা ত শূকরের ভক্ষ্য! হায় এফ-এ উপাধি, তাহাত কৃমিকীটের লক্ষ্য! হায় শিক্ষকতা, তাহা ত অর্থকরীত্বের চরম সোপান। ঐ সকল তুচ্ছ, নগণ্য, পরিত্যজ্য। সে সকল যেন কোন দেবচরিত্রকে কালিমাময় করিতে না পারে! ঐ সকল ফেলিয়া দেও। তবে? তিনি শিক্ষক হইয়া যে রামতনুত্ব পাইয়াছিলেন, তিনি বিদ্যার উপাধি পাইয়া যে উৎকলের বিদ্যাসাগরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তিনি রায়-বাহাদুর হইয়া যে বিনয়ে "গুরুদাসত্ব" উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা কখনও ভুলিও না। বঙ্গে যেমন মেট্রপলিটান, কটকে তেমনি টাউন-স্কুল। বঙ্গে যেমন অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর, কটকে

তেমনি মধুসূদন ও রাধানাথ নব-উৎকল-ভাষার আদি-নিয়ামক। মধুসূদন মিলিলেন রাধানাথে, দুয়ের মিলনে জাগিলেন বিশ্বনাথ,—উৎকল ভাষা-স্বাতন্ত্র্যের দাবি করিয়া জাগিয়া উঠিল। সে জাগরণে বিভেদ-নীতিই জয়যুক্ত হইল, সুতরাং আমরা তাঁহার পক্ষপাতী নহি, তাহাও ফেলিয়া দেও। কিন্তু মধুসূদন যে বাঙ্গালা লিখিতেন, তাহা পরিশুদ্ধ, পরিস্ফুট, তাহাতে তাঁহার সমগ্র হৃদয় খানি ফুটিয়া বাহির হইত। তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি মহারাষ্ট্রীয়, না উৎকলীয়, না বাঙ্গালী, তাঁহার চরিত্র দেখিয়া অনেক সময় তাহা বুঝা যাইত না। আমরা মহারাষ্ট্রীয় বা উৎকলীয় ভাষা জানি না, আমরা যদি বাঙ্গালা ভাষার গুণ কীর্ত্তন করি, তবে তাহা শোভা পায় না। মধুসূদন মহারাষ্ট্রীয় ও উৎকলীয় ভাষা জানিয়াও বাঙ্গালার পরিচর্য্যা করিতেন, বাঙ্গালায় লিখিতেন। নব্যভারতের পাঠকগণ তাহা জানেন। তিনি ঐ দুই ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষায় মিলাইতে যে প্রয়াসী ছিলেন, তদীয় ব্যবহার আচরণে তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি এক, একে তিন যে দিন হইবে, বাঙ্গালায় সে দিন কি সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইবে। তাঁহার সকল সাধনা এই মহাকার্য্যের দিকে ছিল। যেদিন এই মহামিলন আসিবে, সে দিন উৎকলের মধুসূদন বাঙ্গালায় অমরত্ব লাভ করিবেন। সে দিন নিশ্চয় আসিবে। কেননা, মহাপুরুষের অনুসৃষ্টি কখন ব্যর্থ হয় না।

বঙ্গে বা কি আছে? উৎকলে বা কি আছে? মিলন থাকিলে, সব আছে, মিলন ভুলিলে কিছুই নাই। বঙ্গকে বাদ দিয়া কি উৎকলের পৃথকত্ব ভাবিতে পার? উৎকলে বঙ্গ "কেরা" নামে অভিহিত হইলেও, বঙ্গ, উৎকলে এক মহাশক্তি। আর উৎকলের অসংখ্য অধিবাসী বঙ্গে আসিয়া, বঙ্গে থাকিয়া যে ক্ষমতা বিস্তার করিতেছে, তাহা অগ্রাহ্য করে, শক্তি কাহার আছে? দুয়ে এক, একে দুই। বঙ্গের শ্রীচৈতন্য উৎকলকে মাতাইয়া মহামিলনের যে জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহারই শেষ রশ্মি। আমরা চিরকালই ভারতের একীকরণ বা মহামিলনের পক্ষপাতী। নব পার্টিশন এজন্য আমরা অনুমোদন করি নাই। মধুসূদন ও রাধানাথ ছিলেন, এই মিলনের মধ্যবিন্দু। রাধানাথ বৈবাহিক মিলনে বঙ্গের সহিত মিলিত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর মধুসূদন? তিনি পুত্র কন্যার বিবাহ বঙ্গে দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়, উৎকলীয়, বাঙ্গালী একত্র মিলিত। তিনি তিনকে মিলাইলেন, ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাকেও মিলাইলেন। শিবনাথ এক দলের নেতা, বৈবাহিক সূত্রে তদীয় পরিবার মধুসূদন-পরিবারে মিলিত, গৌরগোবিন্দ অন্য দলের নেতা, মধুসূদনের পরিবার সে পরিবারে বৈবাহিক সূত্রে মিলিত, আর মিলিত সাধারণের যদুনাথ, নববিধানের রাজমোহন-পরিবারে। যে মিলন চায়, সে এমনই করিয়াই মিলায়। বক্তৃতা নাই, আন্দোলন নাই,—আস্ফালন নাই, কেমন করিয়া বিভিন্ন পরিবারে মধুসূদন-পরিবার মিলিয়া গেল। যাঁহারা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে সংস্কারবাদী, বিবাহের সময়ে শাঁক বাজানকেও যাঁহারা কুসংস্কার মনে করে, তাঁহাদের সহিতও তিনি বৈবাহিক সূত্রে মিলিলেন। মধুসূদন মিলিতে মিলিতে, মিশিতে মিশিতে এ ভাষায় সে ভাষায়, এ দেশে সে দেশে, এ পরিবারে সে পরিবারে, মিলিতে মিলিতে সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাত্মক হইলেন। রাজার সহিত

মিলিয়া রায়-রাহাদুরী পাইলেন, প্রজার সহিত মিলিয়া ডেমক্রেসীর মহাপ্রাণতা পাইলেন, ধনীর সহিত মিলিয়া রাজ-সম্মান পাইলেন, দরিদ্রের সহিত মিলিয়া দীন পরিচর্য্যার ক্ষেত্র পাইয়া দরিদ্র-বন্ধু হইলেন। মিলিতে মিলিতে—এক শতধা, সহস্রধা হইয়া অনন্ত দেশে, অনন্ত মানব-পরিবারে মিলিয়া বিশ্বমানবত্বে দেহ-বিসর্জ্জন করিয়া অমর হইলেন। এ বিশ্ব-মানবত্ব প্রাপ্তি এ দেশে বড় অধিক লোকের হয় নাই। তিনি তিরোহিত হইয়াছেন, যে বলে, সে মূর্খ। "ক্রন্দন করিও না, ভয় করিও না" আত্মীয়দিগকে এই কথা বলিয়া, তিনি নীরবে-বিশ্ব-মানবত্বে নিমজ্জিত হইলেন এবং দেশ ধন্য হইল।

কিরূপে তিনি মহামিলনের এই অমানুষী শক্তি পাইয়াছিলেন, তাহা এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। তিনি উত্থিত হইয়া সহচর পাইলেন রাধানাথকে, গুরু পাইলেন বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, এবং ঋষি গৌরগোবিন্দকে। বঙ্গে তখন জাগিয়াছিলেন, রামতনু, রাজনারায়ণ, রামকৃষ্ণ, অঘোরনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ, ভুবনমোহন। এ দেশে, সে দেশে অনুপ্রাণন চলিল। অনুপ্রাণনে বঙ্গ ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হইতে লাগিল, কিন্তু উৎকলে মহাপ্রাণতা জাগিয়া উঠিল। সে মহাপ্রাণতা বিশ্ব-মানবত্বে পরিণত হইয়া দেহলীলা পরিসমাপ্ত করিলেন। সে মধুময় অমর চিত্র দেখিয়া আমরা ধন্য এবং কৃতার্থ হইলাম। একাধারে একাকার সচ্চিদানন্দ হরি। আজ সকলে বল, জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

মধুসূদনের জীবন-প্রহেলিকা মহামিলনের এক মহা-ভাগবত। এই মহা মিলনের জন্য তিনি আসিয়াছিলেন বলিয়াই বুঝি বা তিনি অজাত-শত্রু ছিলেন। তিনি সকল শাস্ত্রে, সকল মন্ত্রে, সকল দেশে, সকল পরিবারে একাকার। তিনি কেবল ব্রাহ্মসমাজের ছিলেন না, তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে রমণীর কোমলতা, পুরুষের তেজ, বালকের সরলতা, যুবকের কর্ম্মদক্ষতা, বৃদ্ধের পরিপক্কতা—সকল গুণের সমন্বয় ছিল। তিনি জীর্ণ ও শীর্ণ দেহে এক অমানুষী মহাশক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেহ কখনও ভুলিতে পারিবে না। তিনি মানব-সমাজে এবং মানব পরিবারে চির অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

যে হরিনামের ধ্বনি শতাব্দী এবং যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া ভারতাকাশে ঘুরিতেছিল, তাহা এক অলৌকিক প্রণালীতে মধুসূদনে সংক্রামিত হইয়াছিল। বালক নীরব, স্পন্দরহিত, বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয় তাড়না ভয়ে ভয়ে চাহিতেছে, ভয়ে ভয়ে যাইতেছে—বালক আজ হরি-নাম সরসীতে ডুবিতেছেন। ভেদাভেদ নাই, সম্প্রদায়ের গণ্ডী নাই, বালক অহেতুকী ভাব-সরসীতে ডুবিতেছেন। তোমরা বল একটী একটী, প্রণব বলিলেন, "তিনি সকলকে ভালবাসিতে আসিয়াছিলেন।" তোমরা বল "এ আপন, ও পর, ইহার সহিত মত দিলে তাহার সহিত মিলে না, ইহার এই দোষ, তাহার সে দোষ, সুতরাং মিলিতে পারি না।" মধুসূদন বলিলেন, "সকলেই আমার, সকলকেই আপন করিব।" যাহাকে সকলে ঘৃণা করে, তিনি তাহাকেও আলিঙ্গন করিতেন। জয়ন্ত এবং প্রশান্ত, জগন্নাথ এবং রঘুনাথ, বাসন্তী অবন্তী এবং দেখিয়া অবাক্, তিনি দ'লো-ভাব পরিহার করিয়া অবিভেদে বিষ্ঠাকে চন্দন বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। তুমি, আমি, তিনি, যাহার তাহার সহিত

মিশিতে লজ্জিত হই, কিন্তু বিদ্যাসাগর, রামনাথ বা মধুসূদন লজ্জিত হইতেন না। সেখানে অহেতুকী প্রেম ভক্তি প্রকট, সে দেবধারার এক অনন্ত ধারা। হরিনাম-সিন্ধুতে অবগাহিত হওয়ায় মানবত্ব সেখানে বিশ্বমানবত্বে পরিণত। নামের হিল্লোলে হিল্লোলে, তরঙ্গে তরঙ্গে তাহা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত, অণুপরমাণুতে অনুস্যূত। তাহা অবিনাশী শক্তি, মানবকে জাগাইতে অবতীর্ণ। জাগাইয়া জাগাইয়া শেষে অনন্ত বিশ্ব-মানবত্বে একাকার। মহা-বিশ্ব-মানব-সিন্ধুতে সকল পরিবার, সকল দেশ, সকল সমাজ, সকল সম্প্রদায়, বিমিশ্রিত—সে এক অনন্ত সচ্চিদানন্দের অচ্যুত লীলাখেলা। সে লীলা যে দেখিয়াছে, সে কখনও তাহা ভুলিবে না, সে কখনও বলিবে না যে, "তাহা নাই।" তাহা অবিনাশী, অক্ষয়, অমর চিরজীবন্ত। মহাত্মার জীবন-লীলায় মহেশ্বরেরই প্রকট লীলা। তাহা কি কখনও লোপ পাইতে পারে? একটা সৎকথা একবার উচ্চারিত হইলে কখনও লোপ পায় না, অনন্ত কাল আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহাকে পায়, তাহাকে ধরে। আর এমন একটা মহা জীবন লোপ পাইবে, কখনও সম্ভব নয়। মধুসূদন নাম-মাহাত্ম্যে চির অমর, চির অক্ষয়। তিনি সর্ব্বদেহে, সর্ব্বঘটনায় অনুস্যূত হইয়াছেন। বিধাতার অশেষ দয়ার জয় ঘোষিত হইয়াছে। তবে আজ একবার গগন কাঁপাইয়া বল, জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

ধর্ম্মের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সম্বন্ধ।

ধর্ম্মের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিব। ধর্ম্মের প্রভাব জনসমাজে যত অধিক, এমন আর কিছুরই নয়। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, ধর্ম্মের সঙ্গে অনন্ত পরমেশ্বর ও অনন্ত জীবনের সম্বন্ধ। কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ের প্রভাব ধর্ম্মের প্রভাবের তুল্য নহে। দেশে ও কালে ধর্ম্মের যেমন প্রভাব, এমন আর কোন প্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক শক্তির নহে। ধর্ম্মের প্রভাব দেশে যেমন বহু বিস্তৃত, এবং কালে যেমন বহুকাল স্থায়ী, এমন আর কি আছে? কত রাজা ও সম্রাট্ চলিয়া গেলেন, তাঁহাদের রাজনৈতিক শক্তি কোথায় গেল, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মের নামে আপনাদের শক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রভাব আজ ও দেশে বহুবিস্তৃত ও কালে স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে।

মানব প্রকৃতিতে, ধর্ম্মের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এই তত্ত্বটী বুঝিতে হইলে সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস দেখিতে হয়। ধর্ম্মের শক্তি দেশে যেমন বহু বিস্তৃত এবং কালে যেমন বহু যুগব্যাপী, এমন আর কিছুই নহে। আমাদের দেশে কত রাজা ও সম্রাট্ এবং তাঁহাদের রাজ্য ও সাম্রাজ্য চলিয়া গেল, কিন্তু সেই প্রাচীন কালের মহর্ষিদিগের প্রভাব বহু যুগব্যাপী হইয়া হিন্দুসমাজে কার্য্য করিতেছে। যেমন হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে, সেই রূপ অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে। কত যুগ যুগান্তর হইল, বুদ্ধদেব চলিয়া গিয়াছেন, অথচ কোটি

কোটি লোকের মধ্যে এখনও তাঁহার প্রভাব বর্ত্তমান। সেইরূপ, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বলা যায়।

কত সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি জনসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, কিছুকাল স্থায়ী হয়, তার পর, কোথায় চলিয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্মের নামে যাহা প্রচার হয়, তাহার প্রভাব দেশে যেমন বহু বিস্তৃত এবং কালে যেমন বহুযুগ স্থায়ী, এমন অন্য বিষয়ে একটী দেখা যায় না। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ধর্ম্মের প্রভাব যেমন, এমন আর কিছুরই নহে।

ধর্ম্মের প্রভাব, অন্য বিষয় অপেক্ষা এরূপ বলশালী কেন হয়? ইহার একটী বিশেষ কারণ আছে। সে কারণ এই যে, ধর্ম্মের সঙ্গে অনন্ত পরমেশ্বর ও অনন্ত কালের সম্বন্ধ। অন্য সকল বিষয়ের সঙ্গে অস্থায়ী পার্থিব বিষয়ের সম্বন্ধ। সেই জন্যই ধর্ম্মের প্রভাব এত অধিক।

এখন আমরা দেখাইব যে, বিভিন্ন সভ্য জাতির জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে ধর্ম্ম কিরূপ কার্য্য করিয়াছে। প্রথম দেখ, ইয়োরোপে মার্টিন লুথরের প্রটেষ্টাণ্ট সংস্কার। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম সমাজের সংস্কার কার্য্যে মার্টিন লুথর নিযুক্ত হওয়ার পর, সমগ্র ইয়োরোপ মহাদেশে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। প্রথমে যে উৎসাহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে অন্যান্য বিষয়েও হইতে লাগিল। ইয়োরোপের সকল বিষয়েরই উন্নতি হইতে লাগিল। কি সামাজিক বিষয়, কি শিল্প-বাণিজ্য, কি জ্ঞান চর্চ্চা, কি রাজনৈতিক উন্নতি, সকল বিষয়েরই উন্নতি দেখা গেল।

এইরূপ, বিশেষ ভাবে ইংলণ্ডে দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডে পিউরিট্যানগণের মধ্যে যে ধর্ম্মোৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে অন্য বিষয়েও দেখা গেল। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক উন্নতির যে এক মাত্র কারণ ধর্ম্মোন্নতি, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পিউরিট্যানদিগের মধ্যে যে ধর্ম্মোৎসাহ প্রবল হইয়াছিল, তাহাই রাজনৈতিক বিষয়ে চলিয়া গেল। ক্রমে, ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টের যে উন্নতি হইল, তাহা ঐ ধর্ম্মোন্নতিরই ফল। যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা বলিবেন।

তার পর আমেরিকার কথা বলিব। ইংলণ্ডে রাজা প্রথম চার্লসের সময়ে যে অত্যাচার হইয়াছিল, সেই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ইংলণ্ডের পিউরিট্যানগণ আটলাণ্টিক পার হইয়া নূতন দেশে, নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারিয়া আমেরিকায় আসিয়া বাস করিলেন। সেই জন্য, বর্ত্তমান সময়ের তাঁহাদের বংশধরেরা তাঁহাদিগকে Pilgrim fathers অর্থাৎ তীর্থযাত্রী পিতৃগণ বলিয়া থাকেন। আমেরিকায় যে নূতন দেশ সংস্থাপন হইল, ইহার মূলে ধর্ম্ম।

এইরূপ, দেখিবেন অনেক স্থলেই, জাগতিক ঘটনার মূলে ধর্ম্ম। এখন আমাদের নিজের দেশে আসা যা'ক। পঞ্জাবে কি হইয়াছে, দেখুন। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাব ভূমিতে গুরু নানক এক উচ্চতর ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এক উচ্চতর ধর্ম্মে হিন্দু ও মুসলমানকে এক করিবেন। অনেক হিন্দু ও অনেক মুসলমান, তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। ক্রমে একটী সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। কিন্তু নানকের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। যাহা হউক, সে সকল কথা বলিবার এখন প্রয়োজন নাই। ক্রমে শিখ অর্থাৎ শিষ্য নামক একটী প্রবল

জাতি হইয়া দাঁড়াইল। এক শিখদিগের প্রতাপে দিল্লির বাদ্‌সা আপনার সিংহাসনে বসিয়া ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। এইরূপ শিখ জাতি একটী প্রবল পরাক্রান্ত জাতি হইয়া উঠিল।

পৃথিবীর অনেক বিষয়ে দেখা যায় যে, মূলে ধর্ম্ম, পরে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি। মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয় ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আরব দেশ বহু দেবোপাসনায় পূর্ণ ছিল। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তথায় মহাপুরুষ মহম্মদের আবির্ভাব হইল। ক্রমে, মহম্মদের প্রভাবে আরববাসীগণ একেশ্বরবাদী হইতে লাগিল। ক্রমে একটী দেশব্যাপী সম্প্রদায় হইয়া পড়িল। ক্রমে নিজের দেশ হইতে অন্য দেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল যে, অর্দ্ধেক পৃথিবী গ্রাস করিল।

কেবল যে একেশ্বরবাদ প্রচার হইল, এমন নহে। রাজনৈতিক শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানেরও উন্নতি হইল। এক সময়ে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন দেশে বিশেষ জ্ঞানোন্নতি হইয়াছিল। ভারতবর্ষের জ্ঞান, মুসলমান দেশ সকলের মধ্য দিয়া ইউরোপে প্রচারিত হয়। এইরূপে দেখা যায়, পৃথিবীর অনেক সময়েই ধর্ম্মই মূল। ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উন্নতি, ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি দৃষ্ট হয়।

এতক্ষণ আমরা এক দিক্ দেখিতেছিলাম। সামাজিক ও রাজনৈতিক যে ধর্ম্মোন্নতির উপর নির্ভর করে, ইহাও দেখাইলাম। এখন আর এক দিক্ দেখাইব। সে দিক্ এই যে, ধর্ম্মবিহীনতার ফল কি? ইহার দুই তিনটী দৃষ্টান্ত দিব।

প্রথম ফরাসি-বিপ্লব। এই মহা ঘটনা অবিশ্বাস ও ধর্ম্মবিহীনতার ফল। কোন কোন ফরাসি-লেখক ক্রমাগত প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন। তাহাতে দেশের প্রচলিত ধর্ম্মের উপর সাধারণ লোকের অবিশ্বাস ও অভক্তি হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে এমন এক দল লেখক হইলেন, যাহারা নাস্তিকতা প্রচার করিতে লাগিলেন। ভলটেয়ার, রুসো প্রভৃতি ক্ষমতাপন্ন লেখকগণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিলেন। সেই সকল পাঠ করিয়া সাধারণের মন হইতে ঈশ্বরে বিশ্বাস একেবারে চলিয়া গেল। এমন সময় দেশের জমিদারদিগের প্রবল অত্যাচার। গরিবের উপর ধনীর অত্যাচার। ইহাতে হইল এই যে, সাধারণ দুঃখী লোক মনে করিল যে, কেন এ অত্যাচার সহ্য করি? একজন পরমেশ্বর ত নাই। দেখে কে? আপনাকে আপনি রক্ষা না করিলে কে করে? তবে আর সহ্য করিব না। জমিদারের খাজনা দিব না। দেখি কি করে? আমরা সকলে এক হইয়া জমিদারদিগকে আক্রমণ করিব।

এইরূপে এক দিকে নাস্তিকতা প্রচার, আর এক দিকে জমিদারের অত্যাচার। এই দুই কারণে এই মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। বিপ্লবের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা অসম্ভব। তবে এই বলি যে, এমন হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা সকল এ জগতে কখন, বোধ হয়, ঘটে নাই।

ইহাতে বুঝা যায় যে, নাস্তিকতা কি ভীষণ পদার্থ। অগ্রস্ততঃ সাধারণ লোকের পক্ষে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত যে ইহ সংসার চলিতে পারে না, তাহা ফরাসি-বিপ্লব দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। ফরাসি-বিপ্লবে যে মঙ্গল হইয়াছে, তাহাতে বুঝা

যায় যে, পরমেশ্বর অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উৎপন্ন করেন।

এখনও ইয়োরোপ ও আমেরিকায় দুই দল লোক আছেন, যাহারা আপনাদিগকে সোস্যালিষ্ট ও নিহিলিষ্ট বলিয়া থাকেন। ইঁহারা কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না। জগতের কর্ত্তা একজন পরমেশ্বর আছেন, এ বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী হইতে সকল প্রকার রাজশাসন উঠাইয়া দেওয়া। তাঁহারা বলেন যে, রাজা থাকা জগতের পক্ষে একটা মহা অমঙ্গল। যত রাজাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়া সাধারণতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করা হউক। কিন্তু আমেরিকায় যেরূপ সভাপতি আছেন, ঐ রূপও তাঁহারা ভালবাসেন না। তাঁহারা বলেন, সকলে সমান হইব; এবং সকলের মতে রাজ্য শাসন হইবে। এ মত যে কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব, ইহা তাঁহারা বুঝেন না। তাঁহাদের চেষ্টা পৃথিবীর রাজা সকলকে বধ করা। কি ভয়ানক!

এখন দেখ, আমরা দেখিলাম যে, যেখানে মূলে ধর্ম্ম, সেখানেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য উন্নতি। আর যেখানে ধর্ম্মের অভাব, সেইখানেই যত অমঙ্গল ও অত্যাচার। সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিশেষ ভাবে ধর্ম্মের উপরেই নির্ভর করে। আমাদের দেশে এখন রাজনৈতিক উন্নতির দিকেই অধিক উৎসাহ। তাহা থাকুক্। আপত্তি করিনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ধর্ম্মোন্নতি ও সামাজিক উন্নতি হয়, এমন চেষ্টা হউক. আর অধিক কি বলিব?

পরলোকবাসী শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মিডিয়ম শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে গোস্বামী মহাশয়।

ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার রচিত ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ-মালার সূচনাতে তিন জন প্রধান ব্যক্তির বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার অধিকার প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই তিন ব্যক্তি যে পদ মর্য্যাদা, শিক্ষা ও চরিত্রগুণে সকলেরই গভীর শ্রদ্ধার পাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহারা তিন জনেই এক্ষণে পরলোকে বাস করিতেছেন। প্রথম আনন্দমোহন বসু, দ্বিতীয় শিবচন্দ্র দেব, তৃতীয় উমেশচন্দ্র দত্ত। শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহাদের উচ্চ চরিত্রের উপাদানগুলি বিশ্লেষণ সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, এই তিন মহাত্মার একত্র মিলনের ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইতিহাস হিসাবে ইহাই কি ঠিক খাঁটি সত্য কথা?

শাস্ত্রী মহাশয় যে এ ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার ও অসাধ্য সাধন, বিবরণের পশ্চাতে রাখিয়া দিয়াছেন, এটা সর্ব্ব প্রকারে উত্তম কাজ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে আর মহাত্মার অপূর্ব্ব জীবনলীলা, ও তাহার উত্তম ফলের আলোচনায় এতদূর ঔদাসিন্য প্রকাশ করিতে সাহস করিতে পারেন, ইহা আমাদের কল্পনারও অতীত।